ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪৩৩
এপ্রিল-জুন ২০২৬

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাটকা ধরা থামাই যদি ইলিশে ভরবে সাগর নদী

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ - ২০২৬

(০৭ - ১৩ এপ্রিল)

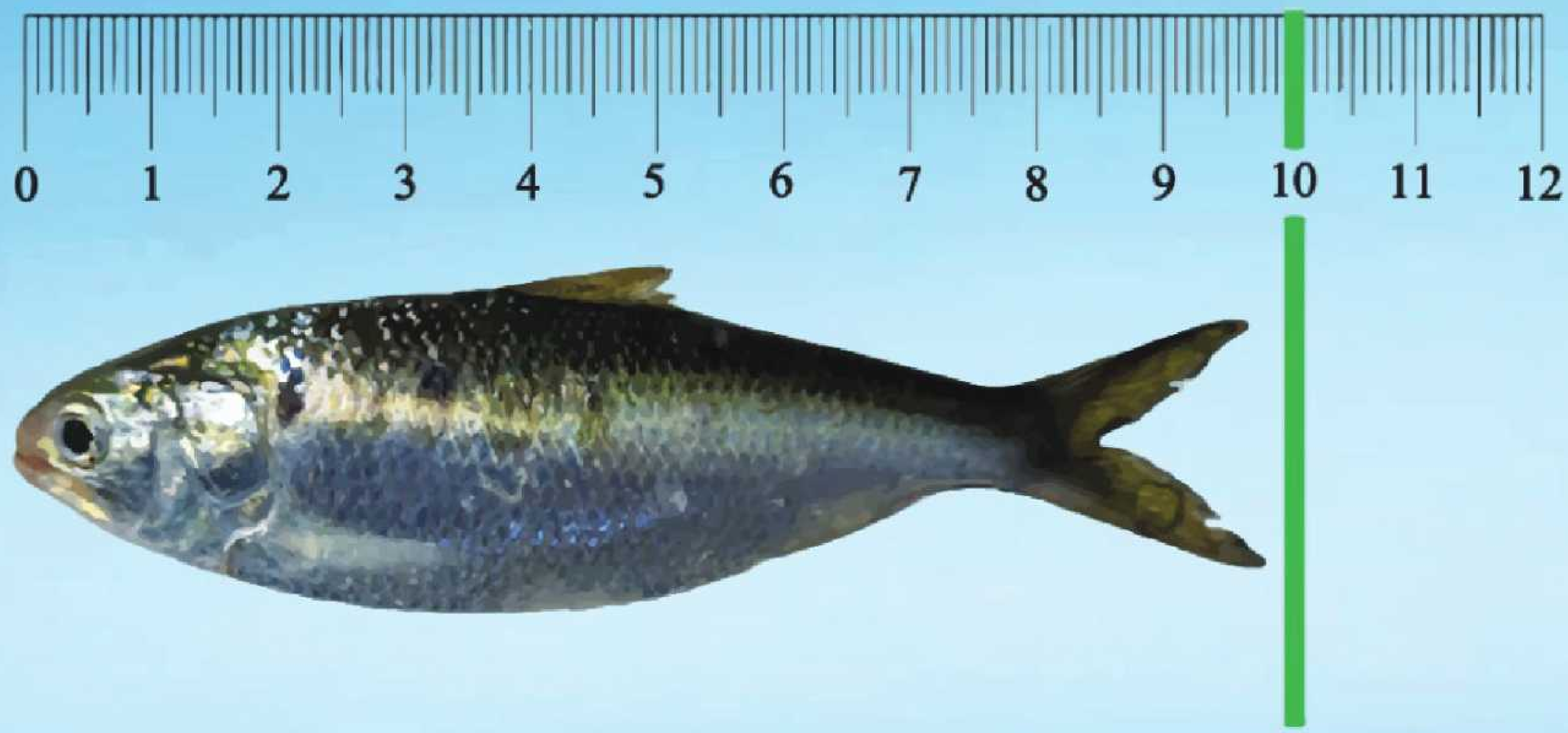

১০ ইঞ্চি (২৫ সেন্টিমিটার) দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট ইলিশ "জাটকা" নামে পরিচিত।

১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, মজুদ ও বিনিময় দণ্ডনীয় অপরাধ।

এই আইন অমান্যকারী অনধিক ২ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড অথবা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন!

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রচারে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

FLID

ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

২য় বর্ষ
৩য় সংখ্যা (৭ম প্রকাশনা)
বৈশাখ-আষাঢ় ১৪৩৩
এপ্রিল-জুন ২০২৬

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

উম্মে হাবিবা
উপপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী

ডা. মনিরুজ্জামান তরফদার
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
ও
মাহবুবা খানম
তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)

সহযোগী সম্পাদক

মো. সামছুল আলম
গণযোগাযোগ কর্মকর্তা

সার্বিক সহযোগিতায়

ইয়াসমিন আক্তার
অনুবাদক

প্রচ্ছদ

নুসরাত মমতাহিনা
চিত্রশিল্পী

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও সম্পাদনা শাখা
০২-৫৫০১২৮০৫-৭

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

ই-মেইল :

headquarter@flid.gov.bd
iol@flid.gov.bd
iof@flid.gov.bd

ওয়েবসাইট

www.flid.gov.bd

সম্পাদকীয়

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশীয় খামারিদের উৎপাদিত পশুর মাধ্যমেই এ বছরও কোরবানির পশুর শতভাগ চাহিদাপূরণ করা সম্ভব হয়েছে। পবিত্র ঈদুল আযহা ২০২৬ উপলক্ষ্যে দেশে মোট ৯৩ লাখ ৬৭ হাজার ৪১৮টি গবাদিপশু কোরবানি হয়েছে। এ বছর কোরবানিযোগ্য পশুর মোট চাহিদা ছিল ১ কোটি ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪টি। এর বিপরীতে দেশে কোরবানিযোগ্য পশুর প্রাপ্যতা ছিল ১ কোটি ২৩ লাখ ৩৩ হাজার ৮৪০টি। বাংলাদেশে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের চাহিদাপূরণে উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি নির্ভরতা কমাতে এবং ভবিষ্যতে বিদেশে রপ্তানির সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে দুধ উৎপানের পরিধি বাড়াতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এর জন্য গবেষণা খাতেও আরও বেশি বরাদ্দ দেওয়া হবে। অন্যদিকে দেশের মৎস্যখাতে বিপুল সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। এ খাতের উন্নয়নে গবেষণা ও উদ্ভাবনের কোনো বিকল্প নেই। গবেষণার মাধ্যমে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন, সরকার তাঁদের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশেষভাবে সম্মানিত করবে। উল্লেখ্য, দেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় থাকা মিঠাপানির মাছকে রোগমুক্ত ও টেকসইভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকারের গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ইলিশ একটি জিআই পণ্য। এটি আমাদের গর্ব, আমাদের সম্পদ। গবেষকদের মতে এর সাথে ৭৫ হাজার কোটি টাকার অর্থনীতি জড়িত। এটি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির একটি বড় অংশ। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে জেলেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১৪ জেলার ৬৯টি উপজেলায় ৩ লাখ ১২ হাজার ৫০০টি মৎস্যজীবী পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৫৮ দিনে মোট ২৪ হাজার ১৬৫ দশমিক ৬২৫ মেট্রিক টন ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এই সহযোগিতার পরিধি এবং পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞাকালীন জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১১টি ট্রেনিং সেন্টারে মৎস্যজীবীদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে । "করবো কাজ, গড়বো দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ"- এই প্রত্যয়কে ধারণ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে দেশকে আরও এগিয়ে নেওয়া এবং একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আশা করি এবারের আমিষ বার্তায় প্রকাশিত সকল ইতিবাচক প্রতিবেদনের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি দেশ ও দেশের বাহিরে ছড়িয়ে পড়বে। তা সর্বস্তরের মানুষের উপকারে আসবে। এর ফলে এ খাত সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দেশ সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
০১.	বিজ্ঞানীদের মৌলিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে হবে : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়	০৩
০২.	দেশীয় পশুতেই শতভাগ কোরবানি সম্পন্ন, দেশে কোরবানি হয়েছে ৯৩ লাখ ৬৭ হাজার পশু : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	০৪
০৩	বগুড়ায় নির্মাণ হলো আধুনিক কসাইখানা	০৫
০৪.	আগামীতে গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়	০৫-০৬
০৫.	মৎস্য আহরণকারীরা কৃষক কার্ডের আওতায় আসবেন : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	০৬
০৬.	কোরবানির মাধ্যমে অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়	০৭-০৮
০৭.	ইলিশ একটি জিআই পণ্য, এটি আমাদের গর্ব, আমাদের সম্পদ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	০৮
০৮.	৮০ লাখ টাকার মাছ বিক্রির আশা ইন্দ্রজিতের	০৯
০৯.	এক ছাগলেই ভাগ্য বদল মমতাজ বেগমের	০৯-১০
১০.	সবাইকে জাটকা সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে হবে : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়	১১
১১.	দেশের অর্থনীতি মজবুত করতে প্রাণিসম্পদ খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	১২
১২.	ধানক্ষেতে মাছ চাষ করে গোলজারের সাফল্য	১৩
১৩.	শেকৃবি গবেষকদের সাফল্য; মুরগির ক্লোয়াকায় টিকা প্রয়োগে দেড়গুণ বেশি অ্যান্টিবডি	১৩-১৪
১৪.	সমুদ্রে ৫৮ দিনে জেলেদের মাঝে ২৪ হাজার মেট্রিক টন ভিজিএফ (চাল) প্রদান	১৪-১৫
১৫.	কৃষি ও মৎস্য খাতের উন্নয়নে জেলা প্রশাসকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়	১৫
১৬.	দুধ উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানি নির্ভরতা কমাতে হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	১৬
১৭.	ইউটিউব দেখে হাঁসের খামার গড়ে যুবকের সাফল্য	১৭
১৮.	রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা ভেটকি মাছ	১৭-১৮
১৯.	আগামীতে অর্গানিক মাংস রপ্তানি করবে বাংলাদেশ : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়	১৯
২০.	জেলেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	২০
২১.	পাঁচ হাজার টাকা পুঁজিতে মুরগির খামার করে সফল তরুণ উদ্যোক্তা	২০-২১
২২.	প্রকল্পের মূল লক্ষ্য কৃষক ও খামারির কল্যাণ নিশ্চিত করা : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়	২১
২৩.	প্রাণিসম্পদ খাতকে সমৃদ্ধ করতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	২১-২২
২৪.	১টি গরু থেকে ফারিয়ার ৬০টি গরুর খামার	২২
২৫.	চিতল মাছ চাষ যেভাবে লাভজনক হতে পারে	২৩
২৬.	পুষ্টি, অর্থনীতি ও নারী খামারির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের দুগ্ধখাত	২৩-২৪
২৭.	সামুদ্রিক মাছের পটকা, পাখনায় বাড়ছে রপ্তানি	২৪-২৬
২৮.	গরুর নাড়ি-ভুঁড়ি হয়ে উঠেছে অর্থকরী	২৬-২৭
২৯.	রাঙ্গাবালীর 'টাইগার' চিংড়িতে স্বাবলম্বী হচ্ছেন নারীরা	২৭
৩০.	মন্ত্রণালয়ে বর্তমান সরকারের ১০০ দিনের গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য উপাত্তের উপর সভা অনুষ্ঠিত	২৭
৩১.	কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা	২৮
৩৩.	বরিশালে বিষমুক্ত মুরগির খামার	২৮-২৯
৩৪.	বিলুপ্ত-বিরল মাছের অনন্য সংগ্রহশালা চাঁদপুরের ফিশ মিউজিয়াম	২৯-৩০
৩৫.	খামারের নিরাপত্তায় মোবাইল নিয়ন্ত্রিত স্বল্প ব্যয়ের ডিভাইস	৩০
৩৬.	কক্সবাজারে যে উপায়ে হচ্ছে বিষমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর শুঁটকির উৎপাদন	৩০-৩১
৩৭.	সরকারি অনুদানের ছাগল পালন করে ঘুরছে গৃহবধূর ভাগ্যের চাকা	৩২

বিজ্ঞানীদের মৌলিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে হবে : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, দেশকে এগিয়ে নিতে বিজ্ঞানীদের সত্যিকার অর্থে মৌলিক গবেষণায় নিয়োগ করতে হবে। গবেষকদের প্রমাণ করতে হবে যে তাদের গবেষণা বিদ্যমান বৈশ্বিক গবেষণা থেকে স্বতন্ত্র, নতুনত্বপূর্ণ এবং বাস্তব সমস্যার কার্যকর সমাধান দিতে সক্ষম। বুধবার ১৭ জুন ২০২৬ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) 'মিঠাপানির মাছের মড়ক প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন' প্রকল্পের ইনসেপশন ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, দেশের মৎস্যখাতে বিপুল সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। এ খাতের উন্নয়নে গবেষণা ও উদ্ভাবনের কোনো বিকল্প নেই। গবেষণার মাধ্যমে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন, সরকার তাদের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশেষভাবে সম্মানিত করবে। সরকার গুণীজন, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের যথাযথ মর্যাদা দিতে চায় এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি বিকাশে তাদের ভূমিকার দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠান থাকলেও এখনো গবেষণার একটি সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র ধারা গড়ে ওঠেনি। দেশে যখন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, তখন তার দৃশ্যমান ফলাফল ও নিজস্ব গবেষণা-ধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। মন্ত্রী আরও বলেন, পানির গুণগত মান মাছ চাষের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। পানিকে মাছের উপযোগী করে তুলতে পারলে মাছের রোগবালাই অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞানী ও মৎস্য কর্মকর্তাদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, দেশের প্রাকৃতিক মাছের অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। কৃষিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহারসহ বিভিন্ন পরিবেশগত কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই দেশীয় মাছের প্রজাতি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে গবেষণা, সচেতনতা এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, দেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় থাকা মিঠাপানির মাছকে রোগমুক্ত ও টেকসইভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী। তিনি বলেন, মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মড়ক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর গবেষণা পরিচালনার কোনো বিকল্প নেই। প্রতিমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, মাছ চাষে অযৌক্তিক ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে, যা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এমনকি গবাদিপশুর জন্য ব্যবহৃত কিছু অ্যান্টিবায়োটিকও মাছের খামারে প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরকে কঠোর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, রাষ্ট্রের প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উচিত নিজ নিজ দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পালন করা। জনগণের করের অর্থে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, তাই জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই সবাইকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. অনুরাধা ভদ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ দেলোয়ার হোসেন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. খালেদ কনক এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. শাহজামান খান। ওয়ার্কশপে প্রকল্পের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো. সিরাজুম মনির। এছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, বিএফআরআই এর বিজ্ঞানীবৃন্দ, গবেষক, মৎস্য বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা উপস্থিত ছিলেন। (সূত্রঃ **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

দেশীয় পশুতেই শতভাগ কোরবানি সম্পন্ন, দেশে কোরবানি হয়েছে ৯৩ লাখ ৬৭ হাজার পশু : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, পবিত্র ঈদুল আযহা ২০২৬ উপলক্ষ্যে দেশে মোট ৯৩ লাখ ৬৭ হাজার ৪১৮টি গবাদিপশু কোরবানি হয়েছে। এ বছর কোরবানিযোগ্য পশুর মোট চাহিদা ছিল ১ কোটি ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪টি। এর বিপরীতে দেশে কোরবানিযোগ্য পশুর প্রাপ্যতা ছিল ১ কোটি ২৩ লাখ ৩৩ হাজার ৮৪০টি। কোরবানি শেষে দেশে ২৯ লাখ ৬৬ হাজার ৪২২টি পশু উদ্বৃত্ত রয়েছে। দেশীয় খামারিদের উৎপাদিত পশুর মাধ্যমেই এ বছরও কোরবানির শতভাগ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। বৃহস্পতিবার, ৪ জুন ২০২৬ সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। দেশব্যাপী কোরবানিকৃত গবাদিপশুর প্রাথমিক হিসাব এবং সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে এ প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন আটটি বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এ বছর মোট কোরবানিকৃত পশুর সংখ্যা ৯৩ লাখ ৬৭ হাজার ৪১৮টি। এর মধ্যে গরু ও মহিষ ৪৮ লাখ ৬৪ হাজার ১৫৮টি, ছাগল ও ভেড়া ৪৫ লাখ ২ হাজার ২৩৩টি এবং অন্যান্য পশু ১ হাজার ২৭টি। বিভাগভিত্তিক হিসেবে সবচেয়ে বেশি পশু কোরবানি হয়েছে ঢাকা বিভাগে এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কোরবানি হয়েছে রাজশাহী বিভাগে। এছাড়া গত বছরের তুলনায় এ বছর কোরবানির পশুর সংখ্যা বেড়েছে ২ লাখ ৩১ হাজার ৪১৮টি। তিনি বলেন, ঢাকা বিভাগে সর্বাধিক ২৩ লাখ ৫১ হাজার ৬৬৬টি পশু কোরবানি হয়েছে। রাজশাহী বিভাগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩ লাখ ৪২ হাজার ৮৬৯টি পশু কোরবানি হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে কোরবানি হয়েছে ১৭ লাখ ৩৪ হাজার ২৫টি পশু। এ ছাড়া রংপুর বিভাগে ১০ লাখ ৫০ হাজার ৫৫৪টি, খুলনা বিভাগে ৮ লাখ ৪৬ হাজার ৫টি, বরিশাল বিভাগে ৪ লাখ ১৬০টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৮১৮টি এবং সিলেট বিভাগে ২ লাখ ৭৪ হাজার ৩২১টি পশু কোরবানি হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ২০২৫ সালে কোরবানির পশুর সম্ভাব্য চাহিদা ছিল ১ কোটি ৩ লাখ ৭৯ হাজার ২০২টি এবং প্রাপ্যতা ছিল ১ কোটি ২৪ লাখ ৪৭ হাজার ৩৩৭টি। ওই বছর দেশে মোট ৯১ লাখ ৩৬ হাজার পশু কোরবানি হয়েছিল এবং উদ্বৃত্ত ছিল ৩৩ লাখ ১১ হাজার ৩৩৭টি পশু। সে হিসেবে গত বছরের তুলনায় এ বছর ২ লাখ ৩১ হাজার ৪১৮টি বেশি পশু কোরবানি হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের সময়োপযোগী নীতি সহায়তা, খামারিদের কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের ফলে প্রাণিসম্পদ খাত আজ একটি শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল অবস্থানে পৌঁছেছে। গ্রামীণ অর্থনীতি আরও শক্তিশালী করা এবং প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার আধুনিক প্রযুক্তি ও খামারিবান্ধব নীতি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. শাহজামান খান-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

“গরু পালনে মনোনিবেশ করি দেশীয় পশুতেই কোরবানি সারি”

বগুড়ায় নির্মাণ হলো আধুনিক কসাইখানা

বগুড়ায় প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ১৭ মে সন্ধ্যায় বগুড়া মহানগরীর জয়পুরপাড়ায় নবনির্মিত আধুনিক জেলা কসাইখানার উদ্বোধন করেন। এরপর কসাইখানা বগুড়া সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বগুড়া জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ডেভেলপমেন্ট অব লাইভস্টক সার্ভিসের আওতায় 'লাইভস্টক অ্যান্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে কসাইখানাটি নির্মাণ করা হয়েছে। বগুড়া মহানগরীর জয়পুরপাড়ায় ৫০ শতক জমির ওপর এটি গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে প্রতি ঘণ্টায় ১৫টি গরু এবং ৩০টি ছাগল বা ভেড়া জবাই ও মাংস প্রস্তুত করা যাবে। যত্রতত্র গরু-ছাগল জবাই করায় যে হারে পরিবেশদূষণ হচ্ছে, তা এখন রোধ হবে। পাশাপাশি মাংস ব্যবসায়ীদের শ্রম ও সময় বাঁচবে। বগুড়া জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. কাজী আশরাফুল ইসলাম জানান, মহানগরীর জয়পুরপাড়ায় ২০২৪ সালের ১৮ মার্চ আধুনিক কসাইখানার নির্মাণকাজ শুরু হয়। কয়েক দফা মেয়াদ বৃদ্ধির পর ঠিকাদার চলতি বছরের ৩০ মার্চ নির্মাণকাজ শেষ করেছেন। তবে আপাতত কসাইখানার কার্যক্রম বন্ধ আছে। লোকবল নিয়োগ দিলে তারাই সেটি পরিচালনা করবেন। নিয়োগ করা লোকবলকে জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের লোকজন প্রশিক্ষণ দেবেন। বগুড়া সিটি করপোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী ওয়াহিদুর রহমান জানান, অত্যাধুনিক কসাইখানাটি বুঝে নেওয়া হয়েছে। বগুড়া সিটি করপোরেশনে নতুন প্রশাসক নিয়োগ হয়েছে। তিনি কসাইখানাটি পরিচালনার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে লিজ দিতে পারেন। লিজগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান সেখানে প্রশিক্ষিত লোকবল নিয়োগ দেবে। এতদিন আধুনিক কসাইখানা না থাকায় যত্রতত্র গরু-ছাগল জবাই করা হতো। এখন আর হবে না। এখানে জবাই করা গরু-ছাগলের মাংসে সিটি করপোরেশনের সিল দেওয়া থাকবে। তিনি বলেন, এখানে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে। ফলে পরিবেশদূষণের আশঙ্কা নেই। এখানে কয়েকটি ধাপে গরু জবাই ও মাংস প্রস্তুত (প্রসেস) করা হবে। এদিকে আধুনিক কসাইখানা উদ্বোধন হওয়ায় জনগণের মাঝে স্বস্তি দেখা দিয়েছে। বগুড়া মহানগরীর সুলতানগঞ্জপাড়ার সিরাজুল ইসলাম, বৃন্দাবনপাড়ার আবদুল গফুর, নিশিন্দারার সেকেন্দার আলী ও জয়পুরপাড়ার মিজানুর রহমান বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় কসাইরা রাতের আঁধারে বা খুব ভোরে গাভি, রুগ্ন ও অসুস্থ ষাঁড় জবাই করে দেশি ষাঁড়ের মাংস বলে বিক্রি করে থাকেন। এছাড়া তারা ভেড়া, পাঁঠা বা রুগ্ন ছাগল জবাই করে দেশি ভালো ছাগলের মাংস বলে বিক্রি করেন। দীর্ঘদিন পর হলেও বগুড়ায় আধুনিক কসাইখানা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মাংস বিক্রেতারা ইচ্ছা করলেই এখন জনগণকে ঠকাতে পারবে না। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

আগামীতে গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, আগামীতে গবেষণা খাতে আরও বেশি বরাদ্দ দেওয়া হবে। গবেষণা ছাড়া দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। গবেষণার ক্ষেত্রে সরকার কোনো কার্পণ্য করবে না। তবে প্রকৃত অর্থে গবেষণা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে। মঙ্গরবার ১৬ জুন ২০২৬ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) বাস্তবায়নাধীন 'মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন (প্রথম সংশোধিত)'-শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মহিষ পালনকে জনপ্রিয় করার ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, উন্নত দেশগুলোতে মহিষের দুধ একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আমাদের দেশের চরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে কৃষিকাজ কম হয়। সেখানে লবণাক্ত মাটির উপযোগী লবণ-সহিষ্ণু ঘাসের চাষ সম্প্রসারণ করা গেলে মহিষ পালন বিকাশের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে। তবে ভবিষ্যতে কৃষিজমির ওপর চাপ বৃদ্ধি পাবে। তাই সীমিত জায়গায় কীভাবে লাভজনকভাবে মহিষ পালন করা যায়, সে বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। এর আগে সকালে মন্ত্রী বিএলআরআইতে পৌঁছে প্রতিষ্ঠানটির ছাগল গবেষণা খামার পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বলেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য ও গৌরবের অংশ। আমরা দেশব্যাপী ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বিস্তার ও উন্নয়নে কাজ করতে চাই। তিনি আরও বলেন, শিক্ষিত বেকার তরুণদের কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালন ও খামার স্থাপনে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি দেশের প্রাণিসম্পদ খাতও আরও সমৃদ্ধ হবে। বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. শাহজামান খান। এ সময় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অর্জন তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক এবং বিএলআরআইয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গৌতম কুমার দেব। কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, মহিষ সংক্রান্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

মৎস্য আহরণকারীরা কৃষক কার্ডের আওতায় আসবেন : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ইতোমধ্যেই সাধারণ জনগণের জন্য ফ্যামিলি কার্ড এবং কৃষকদের জন্য কৃষক কার্ড প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছেন। আর মৎস্য আহরণকারীরাও কৃষক কার্ডের আওতায় আসবেন। বুধবার ৬ মে ২০২৬ দুপুরে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণনকেন্দ্রে কাপ্তাই হ্রদে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও মৎস্যজীবীদের মাঝে ভিজিএফ (চাল) বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, কাপ্তাই লেক বাংলাদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতীতে এই লেক থেকে যে পরিমাণ মাছ আহরণ করা হতো, বর্তমানে তা আর পাওয়া যাচ্ছে না। আজ যে পোনা মাছ অবমুক্ত করা হচ্ছে, তা বড় হয়ে এখানকার মৎস্য শিকারিরাই আহরণ করবেন। তবে মাছগুলো বড় হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে। তিনি বলেন, সরকার সবসময় মৎস্যজীবীদের পাশে রয়েছে। তাই মাছের উৎপাদন নিশ্চিত করতে পোনা মাছগুলোকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে, যাতে দেশের চাহিদাপূরণের পাশাপাশি মৎস্যজীবীরাও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারেন। এ লক্ষ্যে তিনি সকলকে তিন মাস মাছ আহরণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে সকলকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং বাংলাদেশকে হৃদয়ে ধারণ করে চলতে হবে। তিনি বলেন, কাপ্তাই লেক একটি জাতীয় সম্পদ, যেখানে প্রতিনিয়ত দেশি-বিদেশি পর্যটকরা আসেন। তাই এ লেকে কোনো ধরনের ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে সবাইকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা যদি নিজেরা সচেতন হই, তাহলে কাপ্তাই লেককে অনেকাংশে দূষণমুক্ত রাখা সম্ভব। অন্যথায়, ক্রমাগত দূষণের ফলে একসময় এটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়তে পারে। তিনি বলেন, লেককে দূষণমুক্ত রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং পর্যটনসংশ্লিষ্টদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এছাড়া কাপ্তাই লেকের নাব্যতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় খনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএফডিসি) চেয়ারম্যান মো. ইমাম উদ্দীন কবীরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) রাঙ্গামাটির সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আবু মোহাম্মদ সিদ্দিক আলম, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. অনুরাধা ভদ্র, রাঙ্গামাটির ভারপ্রাপ্ত জেলাপ্রশাসক মো. মোবারক হোসেন, নৌ-পুলিশ চট্টগ্রাম অঞ্চলের পুলিশ সুপার বিএম নুরুজ্জামান ও রাঙ্গামাটির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ইকবাল হোছাইন প্রমুখ। উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার কাপ্তাই হ্রদনির্ভর ২৬ হাজার ৮৪৫টি জেলে পরিবারকে প্রথম ধাপে পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে দুই মাসের জন্য মোট ৪০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হবে, যার মোট পরিমাণ ১ হাজার ৭৪ মেট্রিক টন। এছাড়া চলতি মৌসুমে কাপ্তাই হ্রদে ৬০ মেট্রিক টনেরও বেশি মাছের পোনা অবমুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বিএফডিসি। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

"মাছ উৎপাদনে এগিয়ে দেশ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ"

কোরবানির চামড়া ও উপজাত সংরক্ষণে অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, কোরবানির পশুর মাংসের পাশাপাশি চামড়া ও অন্যান্য উপজাত সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা গেলে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব। বৃহস্পতিবার ২১ মে ২০২৬ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এ অনুষ্ঠিত “কোরবানি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২৬ (মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী, চামড়া সংরক্ষণকারী এবং ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম)”-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কর্মশালা আয়োজন করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম, প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বশীল ভূমিকার প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, কোরবানির পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, কোরবানিকে কেন্দ্র করে বিপুলসংখ্যক মানুষ পশু জবাই, চামড়া ছাড়ানো, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বণ্টনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। এ বাস্তবতায় দক্ষ জনবল তৈরির বিকল্প নেই। বিশেষ করে চামড়া ছাড়ানোর মতো সংবেদনশীল কাজে প্রশিক্ষিত জনবল না থাকলে চামড়ার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর বাজারমূল্য কমে যায়। মন্ত্রী বলেন, দেশের মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট তরুণদের প্রশিক্ষণের আওতায় এনে কোরবানির সময় দক্ষ জনবল তৈরি করা যেতে পারে। এতে একদিকে চামড়ার গুণগত মান উন্নত হবে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও স্বল্পমেয়াদি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, সরকার প্রয়োজনে সারা বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করবে, যাতে কোরবানির সময় দক্ষতার অভাব না থাকে। মন্ত্রী আরও বলেন, কোরবানির চামড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাদ্রাসায় দান করা হয়। এ বাস্তবতায় চামড়া সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় লবণ সরবরাহসহ সরকারি সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। সঠিকভাবে চর্বি পরিষ্কার, লবণ প্রয়োগ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা গেলে চামড়ার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে কোরবানিযোগ্য পশু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দেশীয় উৎপাদন দেশের চাহিদাপূরণে সক্ষম। দেশীয় খামারিদের সুরক্ষা ও জাতীয় স্বার্থে অবৈধভাবে পাচার বা চোরাই পথে আসা পশু ক্রয়ের বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের খামারিদের স্বার্থ রক্ষায় সবাইকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জনগণের সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে কোরবানির ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান আরও বাড়বে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, অবৈধভাবে আসা পশু ক্রয় করে কোরবানি দেওয়া কতটা সমীচীন-এ বিষয়ে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে সচেতনতা তৈরি প্রয়োজন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোরবানির পশু ক্রয় ও ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বৃদ্ধি, দেশীয় খামারিদের সুরক্ষা এবং চামড়া সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। তিনি বলেন, দেশে কোরবানির পশুর চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি থাকা সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে অবৈধ বা চোরাই পথে পশু প্রবেশের ঘটনা ঘটে। তিনি দেশীয় খামারিদের স্বার্থ রক্ষায় জনগণকে অবৈধভাবে আসা পশু বর্জনের আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে নয়, সম্পদ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। যুবসমাজকে দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি মাদকসহ সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কার্যক্রমকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। দেশীয় উৎপাদন, খামারি ও জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থ রক্ষায় সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. শাহজামান খানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন। এসময় স্বাগত বক্তব্য দেন অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. মো. বয়জার রহমান এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিচালক ডা. বেগম শামছুননাহার আহম্মদ, পরিচালক ড. এ. বি. এম. খালেদুজ্জামান। কর্মশালায় মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী, চামড়া সংরক্ষণকারী এবং ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

ইলিশ একটি জিআই পণ্য, এটি আমাদের গর্ব, আমাদের সম্পদ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, ইলিশ একটি জি আই পণ্য, এটি আমাদের গর্ব আমাদের সম্পদ। এর সাথে ৭৫ হাজার কোটি টাকার অর্থনীতি জড়িত। এটি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির একটি বড় অংশ। এর উৎপাদন যদি আরও বাড়ানো যায় তাহলে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। মঙ্গলবার ১৬ জুন ২০২৬ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত 'জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৫-২৬ এর মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ করনীয়' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সব কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, প্রায় ৪০ লক্ষ্যের অধিক মানুষ এর সাথে জড়িত। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের সাথে রিলেটেড। এজন্য এ ব্যাপারে আমাদের সর্বোচ্চ সজাগ থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে, জাল কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে। কারেন্ট জালের ব্যাপারে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। মুন্সিগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় জাল তৈরির কারখানা রয়েছে। এজন্য স্থানীয় কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, মা ইলিশ রক্ষায় ২ মাসের নিষেধাজ্ঞার সময় জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য চিন্তা করতে হবে এবং গবেষণার প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেন, গত বছর ৪০ হাজার জেলেকে ভিজিএফ এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এই সহযোগিতার পরিধি এবং পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে; যাতে করে নিষেধাজ্ঞাকালীন মাছ ধরা থেকে জেলেদের বিরত রাখা যায়। মা ইলিশ ধরা থেকে বিরত রাখতে মৎস্যজীবী ভাই-বোনদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। এজন্য এদের ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন। এসময়ে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের প্রায় ১১টি ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। সেগুলো যাতে এক্টিভভাবে কাজ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, কৃষির উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যায় এবং মৎস্য সম্পদ কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেই লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রথমে খাল খনন কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। এবং প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইলিশ রক্ষায় ২০০৩ সালে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় আজকের প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে। বিশেষ করে ইতোমধ্যে খাল খনন কর্মসূচি শুরু করেছেন এবং কৃষক কার্ড ও ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মৎস্যজীবীরাও কৃষক কার্ড পাবেন। বাংলাদেশের সবাই ফ্যামিলি কার্ড পাবে। আগামী বছরের জুলাইয়ের পর থেকে ম্যাক্সিমাম উপজেলায় ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া শুরু হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে চাহিদাও বাড়ছে; এর সাথে উৎপাদনও বাড়াতে হবে। এই উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আমরা যদি প্রত্যেক জায়গায় সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে আমরা এ দেশকে সামনের দিকে আরও এগিয়ে নিতে সক্ষম হব। কর্মশালায় মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. খালেদ কনকের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অনুরাধা ভদ্র, মৎস্য ও প্রণিসম্পদ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) নীলুফা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য অনুবিভাগ) সৈয়দা নওয়ারা জাহান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উপ পরিচালক (ইলিশ ব্যবস্থাপনা) আবুল কালাম আজাদ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্রঃ নিজস্ব প্রতিবেদক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর)**

"রুপালি ইলিশ নোনা জলের রানি সবার সেরা সবাই জানি"

৮০ লাখ টাকার মাছ বিক্রির আশা ইন্দ্রজিতের

মাছ চাষ করে চমক দেখিয়েছেন ইন্দ্রজিৎ কুমার বিশ্বাস, মাগুরা জেলার শতখালী ইউনিয়নের বয়রা গ্রামের মাছ চাষি ইন্দ্রজিৎ কুমার বিশ্বাস ৭ একর পুকুর লিজ নিয়ে দেশীয় ও উচ্চমূল্যের মাছ চাষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন। প্রতি একরে ১ লাখ টাকা হিসেবে মোট ৭ লাখ টাকায় পুকুর লিজ নিয়ে এবারই প্রথম বড় পরিসরে চাষ শুরু করেন তিনি। ছোট ছোট পুকুরে মাছ চাষ করলেও এবার নতুন উদ্যোগে ট্যাংরা, পাবদা, দেশি জাতের রুই, কাতল ও সিলভার কার্প চাষ করে চমক দেখিয়েছেন। ইন্দ্রজিৎ কুমার বিশ্বাস জানান, মোট বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ৫২ লাখ টাকা। এরই মধ্যে প্রায় ১৪০ মণ মাছ বিক্রি করে ১৪ লাখ টাকা আয় করেছেন। ১০ এপ্রিল প্রায় ৩০ মণ সাদা মাছ বিক্রি হয়েছে। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী রুই ৩০০ টাকা, সিলভার কার্প ২২০ টাকা এবং পাবদা ৩৩০ টাকা কেজিদরে বিক্রি হচ্ছে। সব মিলিয়ে তার মোট বিক্রির পরিমাণ প্রায় ৮০ লাখ টাকায় পৌঁছাতে পারে বলে আশা করছেন তিনি। তিনি বলেন, 'সিলভার কার্প মাছ ৫-৬ কেজি, কাতল ৪ কেজি, রুই ২ কেজি পর্যন্ত হয়েছে। পাবদা কেজিতে ৮-১০টি উঠছে। ট্যাংরা এখনো পুরোপুরি ধরা না পড়লেও আনুমানিক ৫০ কেজির মতো হয়েছে। ট্যাংরা এক মাস পর বিক্রির কথা ছিল কিন্তু মাছ দ্রুত বড় হয়ে গেছে। নতুন পাবদা চাষে ভালো সাড়া পেয়ে এবার বাজারজাত করছি।' মাছ চাষে তাকে জেলা মৎস্য অফিসের পাশাপাশি সহযোগিতা করছে অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এডিআই)। এডিআইয়ের কৃষি ইউনিটের ফোকাল পারসন ও মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ নূর আমিন মুকুল বলেন, 'পিকেএসএফ ও এডিআইয়ের সহযোগিতায় ২০১৪ সাল থেকে মাগুরা ও যশোরে বিভিন্ন প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করলেও পাবদা চাষে তেমন সফলতা আসছিল না। অবশেষে ইন্দ্রজিৎ দাদার পুকুরে আমরা পাবদা চাষে সফল হয়েছি। এখন কেজিতে ৮-১০টি সাইজের পাবদা উঠছে, যা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্য।' তার মতে, 'এ অঞ্চলের মানুষের ধারণা ছিল পাবদা চাষ সম্ভব নয়। কিন্তু প্রযুক্তিগত সহায়তা ও সঠিক ব্যবস্থাপনায় সেই ধারণা বদলে গেছে।' মাছ চাষ দেখতে আসা সুজন কুমার বিশ্বাস বলেন, 'শুনেছিলাম এখানে উন্নতমানের মাছ চাষ হচ্ছে। জাল টানতে এসে দেখলাম সত্যিই বড় বড় রুই, কাতল, সিলভার কার্প হয়েছে। পাবদাও ৮-১০টি কেজি সাইজের। আমিও সামনে এমন চাষ করার চেষ্টা করবো। সেজন্যই মূলত দেখতে আসা।' স্থানীয় জেলে সুনীল কুমার বিশ্বাস বলেন, 'এ বছর এমন বড় পাবদা আর কোথাও পাইনি। কাতল, সিলভার, রুই–সব মাছই খুব ভালো সাইজের হয়েছে। এই পুকুরের মাছের মান ভালো।' মাগুরা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন চন্দ্র সরকার বলেন, 'জেলায় বছরে মোট ১৯,৬৯২ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়। যেখানে চাহিদা ২৩,০০২ মেট্রিক টন। অর্থাৎ ঘাটতি রয়েছে ৩,৩১০ মেট্রিক টন। এই ঘাটতি পূরণে আমরা সচেতনতা বৃদ্ধি, দেশীয় প্রজাতি সংরক্ষণে অভয়াশ্রম স্থাপন এবং মৎস্য আইন বাস্তবায়নে জোর দিয়েছি।' তিনি বলেন, 'প্রতি উপজেলায় বছরে অন্তত একটি করে অভয়াশ্রম স্থাপন করা হচ্ছে। ক্ষতিকর জাল ব্যবহার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বেসরকারি সংস্থা সিএনআরএস ও এডিআইয়ের সহায়তায় জেলায় এ বছর ২০টি অভয়াশ্রম নির্মাণ হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের প্রজাতি আবারও ফিরে আসছে।' **(সূত্রঃ জাগো নিউজ ২৪.কম, ১১ এপ্রিল ২০২৬)**

এক ছাগলেই ভাগ্য বদল মমতাজ বেগমের

২০২২ সালের কথা। ৯ হাজার টাকা এনজিও থেকে অনুদান পেয়ে একটি গর্ভবতী ছাগল কিনেছিলেন মমতাজ বেগম। এক মাস পরই ছাগলটি তিনটি বাচ্চা দেয়। এরপর ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়তে থাকে। ছাগলের সংখ্যা বেড়ে ৯১টিতে দাঁড়ায়। এর মধ্যে ৬১টি বিক্রি করে প্রায় তিন লাখ টাকা আয় করেছেন মমতাজ। এখনো তার কাছে ছোট-বড় মিলিয়ে ৩০টি ছাগল রয়েছে। পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের হাজিপুর গ্রামের গৃহবধূ মমতাজ বেগম। মাত্র একটি ছাগল দিয়ে শুরু করে চার বছরে তিনি গড়ে তুলেছেন ৯১টি ছাগলের একটি সফল খামার, যা বদলে দিয়েছে তার পরিবারের ভাগ্য। ছাগল বিক্রির টাকাতেই চলছে তাদের সংসার। মেয়েদের বিয়ে, সন্তানের পড়াশোনা এবং চিকিৎসার খরচ–সবই মেটানো হয় খামারের আয় থেকে। তবে বর্তমানে লিভারজনিত রোগে আক্রান্ত মমতাজ বেগম। যা তার জীবনে নতুন এক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। অসুস্থতা সত্ত্বেও থেমে যাননি তিনি।

প্রতিদিন ঘরের কাজের পাশাপাশি ছাগলের পরিচর্যা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এ খামার চালিয়ে নিতে এখন তিনি নানা সমস্যার মুখোমুখি। বিশেষ করে নিরাপদ পানির অভাব বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন কোমরসমান কাদা ও পানি পাড়ি দিয়ে খাল থেকে পানি আনতে হয়, যা তার শারীরিক অবস্থার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। খামারের জন্য উপযুক্ত ঘর এবং জায়গার সংকটও রয়েছে। ভবিষ্যতে ছাগলের সংখ্যা আরও বাড়লে এ সংকট তীব্র হবে বলে আশঙ্কা করছেন মমতাজ বেগম। মমতাজ বেগম বলেন, ‘আমার এ ছাগলই এখন আমাদের বাঁচার অবলম্বন। এইগুলা বেঁচে সংসার চলে। মেয়েদের পড়াশোনা চলে, আমার চিকিৎসাও চলে। কিন্তু আমি অসুস্থ হওয়ায় আগের মতো সবকিছু সামলানো অনেক কষ্টকর হয়ে গেছে। তারপরও হাল ছাড়ি নাই। যত কষ্টই হোক, এই খামার আমি ধরে রাখতে চাই।’ ‘আমার এ ছাগলই এখন আমাদের বাঁচার অবলম্বন। এইগুলা বেঁচে সংসার চলে। মেয়েদের পড়াশোনা চলে, আমার চিকিৎসাও চলে। কিন্তু আমি অসুস্থ হওয়ায় আগের মতো সবকিছু সামলানো অনেক কষ্টকর হয়ে গেছে।

তারপরও হাল ছাড়ি নাই। যত কষ্টই হোক, এই খামার আমি ধরে রাখতে চাই।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা পানি। খামারের ছাগলগুলোর জন্য প্রতিদিন অনেক পানি লাগে। কিন্তু বাড়ির পাশে কোনো গভীর নলকূপ নেই। তাই বাধ্য হয়ে কোমরসমান কাদা-পানি পারি দিয়ে খাল পার হয়ে অন্যের বাড়িতে গিয়ে পানি আনতে হয়। আমার এই অসুস্থ শরীরে এই কাজ করা খুবই কষ্টের। অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ি। যদি একটা নলকূপ থাকতো, তাহলে এই কষ্ট অনেকটা কমে যেতো।’ বাড়িতে টিউবওয়েল না থাকায় কাদা-পানি মাড়িয়ে পানি আনতে হয় মমতাজ বেগম ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বামী খোরশেদ আলম বলেন, ‘আমার স্ত্রী অনেক কষ্ট করে এই খামার দাঁড় করাইছে। আমি অসুস্থ থাকায় আগে তেমন কিছু করতে পারতাম না। এখনো যতটা পারি, তাকে সাহায্য করি। আমরা ভালো জাতের পাঁঠা কিনে ছাগলের বংশ বাড়াইছি। তাই বাচ্চাগুলোও ভালো হয়। ভালো দামে বিক্রি করা যায়। ঘর সংকটে প্রতিবছর ছোট থাকতেই ছাগল বিক্রি করে দেই।’ সমস্যার কথা জানিয়ে তিনি বলেন,‘এখন আমাদের বড় সমস্যা জায়গা আর খামারের ঘর। ছাগলের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জায়গার সংকট বাড়ছে। সামনে আরও কয়েকটা ছাগল বাচ্চা দেবে। তখন এই সংকট আরও বাড়বে। সরকার যদি একটু সহযোগিতা করে একটা ভালো ঘর আর জায়গার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে আমরা আরও বড় পরিসরে খামার করতে পারবো।’ প্রতিবেশী ফাতেমা বেগম বলেন, ‘মমতাজ আপার কষ্ট আমরা নিজের চোখে দেখছি। উনি যেভাবে একটার পর একটা ছাগল বাড়াইছে, তা সত্যিই অনুপ্রেরণার। আগে আমরা ভাবতাম, ছাগল পালন করে তেমন কিছু হয় না। কিন্তু এখন দেখি, ঠিকভাবে করলে এইটা দিয়াও সংসার চালানো যায়। আমরাও এখন আগ্রহী হচ্ছি।’ আরেক প্রতিবেশী শামীম হোসেন বলেন, ‘মমতাজ বেগম ৯ হাজার টাকা ধার করে তার জার্নি শুরু করেছেন। এখন লাখ লাখ টাকা আয় করছেন। তার সংসারের অবস্থা আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে। আমরা তার কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছি। আমরাও চাই তার মতো স্বাবলম্বী হতে।’ শুধু নিজের ভাগ্য বদল নয়, অন্য নারীদের ভাগ্য বদলানোর পরামর্শও দিয়েছেন এই সংগ্রামী নারী। গ্রামের নারীদের উদ্দেশ্য করে মমতাজ বেগম বলেন, ‘ছাগল পালন খুব কঠিন না। একটু যত্ন নিলেই হয়। আমি চাই, আমার মতো আরও অনেক নারী এগিয়ে আসুক। নিজের পায়ে দাঁড়াক। সংসারে সুখ আসুক।’ সফল উদ্যোক্তা মমতাজ বেগমের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ইয়াসীন সাদেক। তিনি বলেন, ‘এমন সাহসী নারীদের সফলতায় সরকারও অংশ নিতে চায়। আমরা তাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবো। টিউবওয়েলের জন্য আবেদন করলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবো।’ **(সূত্রঃ জাগো নিউজ ২৪.কম, ১৫ এপ্রিল ২০২৬)**

মৎস্যজীবী থেকে ভোক্তা সবাইকে জাটকা সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে হবে : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, জাটকা নিধন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে এবং এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। জাতীয় সম্পদ ইলিশ রক্ষায় তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে মৎস্যজীবী থেকে ভোক্তা-সবাইকে জাটকা সংরক্ষণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মঙ্গলবার ৭ এপ্রিল চাঁদপুর সদরের মোলহেডে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৬ এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে এসব কথা বলেন । মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ দেশের গর্ব ও ঐতিহ্য। ১৯৭৮-৮১ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ইলিশকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে ২০০৩-০৪ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, একসময় দেশে প্রায় ২০ লক্ষ টন ইলিশ উৎপাদিত হলেও তা কমে প্রায় দুই লক্ষ টনে নেমে আসে। বর্তমানে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের ফলে উৎপাদন পুনরায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাটকা নিধন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা গেলে দেশে ইলিশের উৎপাদন ২০ লক্ষ টন ইলিশ উন্নত করা সম্ভব। তিনি বলেন, চাঁদপুর দেশের ইলিশ উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, যেখানে মোট উৎপাদনের প্রায় ৮০ শতাংশ পাওয়া যায়। তবে এক সময়কার প্রাচুর্যের তুলনায় বর্তমানে ইলিশের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, যার প্রধান কারণ জাটকা নিধন। মন্ত্রী বলেন, একটি ডিমভর্তি ইলিশ ধরা মানে হাজার হাজার ভবিষ্যৎ মাছ ধ্বংস করা। তাই ইলিশ সংরক্ষণে সবার সচেতনতা জরুরি। তিনি বলেন, সরকার জেলেদের জন্য চাল, তেলসহ বিভিন্ন মানবিক সহায়তা প্রদান করছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬৫০০ টাকা। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, সরকারি সহায়তার পাশাপাশি জেলেদের দায়িত্বশীল আচরণই ইলিশ সংরক্ষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মন্ত্রী জেলেদের উদ্দেশ্যে বলেন, অন্তত দুই মাস মাছ ধরা থেকে বিরত থাকলে ছোট ইলিশ বড় হয়ে অধিক ওজনের হবে, যা ভবিষ্যতে বেশি লাভজনক হবে। তিনি বলেন, ইলিশ এখন আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের একটি পরিচিত ব্র্যান্ড। "ইলিশ মানেই বাংলাদেশ"-এই সুনাম ধরে রাখতে হলে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। চাঁদপুর অঞ্চলের চর ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা গেলে ইলিশ উৎপাদন আরও বাড়বে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য করেন চাঁদপুর-৩ (সদর-হাইমচর) আসনের সংসদ সদস্য শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দা নওয়ারা জাহান, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জিয়া হায়দার চৌধুরী, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অনুরাধা ভদ্র, জেলা প্রাশসক আহমেদ জিয়াউর রহমান, পুলিশ সুপার মো. রবিউল হাসান, জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট এ কে এম সলিম উল্যা সেলিম। এসময় নৌ বাহিনী, কোস্টগার্ড, নৌ পুলিশ, স্হানীয় মৎস্যজীবী, জেলেসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৬ দেশের ইলিশসমৃদ্ধ ২০টি জেলায় পালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য-"জাটকা ধরা থামাই যদি, ইলিশে ভরবে সাগর-নদী"। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

দেশের অর্থনীতি মজবুত করতে প্রাণিসম্পদ খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

প্রাণিসম্পদ খাতকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এমপি বলেছেন, দেশের অর্থনীতি মজবুত করতে এ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য এ খাতের কোনো বিকল্প নেই। শনিবার ২৫ এপ্রিল বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এ বছর "Veterinarians: Guardians of Food and Health" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস-২০২৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ আজকের বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভেটেরিনারি পেশাজীবীরা মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি বলেন, সময়ের সাথে সাথে মানুষ খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে আরও সচেতন হচ্ছে। একসময় ভেটেরিনারি পেশাকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া না হলেও বর্তমানে এ খাতে মানুষের আগ্রহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে ভেটেরিনারি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। তিনি বলেন, প্রাণীরা তাদের সমস্যা প্রকাশ করতে পারে না। তাই তাদের চিকিৎসা ও সুস্থ্য রাখা অত্যন্ত কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং কাজ। এ খাতে যারা কাজ করছেন তারা অত্যন্ত মেধাবী ও যোগ্য। তিনি আরও বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান সরকারও এই খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি ও ভেটেরিনারি সায়েন্স বর্তমানে একটি জটিল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে; তবে আমরা পারস্পরিক আলোচনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এর কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করব। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে সকল সমস্যা সমাধান সম্ভব এবং সবাই সমানভাবে উপকৃত হবে। সরকারের অগ্রাধিকার তুলে ধরে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নিরলস-ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত কৃষক কার্ডের আওতায় আসছে; ফলে কৃষকদের মতো এ খাতের খামারিরাও সমান সুবিধা পাবেন। তিনি দেশের উন্নয়নে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ দেশ আমাদের-সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ভ্যাব)-এর সভাপতি প্রফেসর ড. মো. মাহবুব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. শাহজামান খান, অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. মো. বয়জার রহমান। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ভ্যাব-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ও প্রকল্প পরিচালক ডা. মো. আবদুর রহিম। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ড. এম. আরিফুল ইসলাম, যেখানে ভেটেরিনারি পেশার সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরা হয়। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভেটেরিনারিয়ানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিমন্ত্রী এর আগে বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও উদ্বোধনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

"ডিমে আছে উন্নত প্রোটিন শক্তি পাবে সারাদিন"

ধানক্ষেতে মাছ চাষ করে গোলজারের সফলতা

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার হাজীপুর গ্রামের গোলজার হোসেন (৫০) এক সময় অভাবের তাড়নায় দিন মজুরের কাজ করতেন। এখন তিনি এলাকায় পরিচিত ধানক্ষেতে মাছ চাষের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে। তিনি শুধু নিজের ভাগ্যই বদলাননি। তাঁর দেখানো পথে সচ্ছলতা এসেছে গ্রামের আরও অনেক পরিবারে। স্থানীয়রা গুলজারকে এখন ধানক্ষেতে মাছ চাষের 'গুরু' বলেই চেনেন। উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরের ইকরচালী ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে এখন ধানক্ষেতেই মাছ চাষের দৃশ্য চোখে পড়ে। সবুজ ধানের মাঝখানে জমে থাকা পানিতে বিভিন্ন জাতের মাছ চাষ করেন কৃষকরা। ধান ও মাছের এই সমন্বিত চাষ এখন গ্রামের পরিচিত কৃষি পদ্ধতি। গোলজার হোসেন জানান, ৬ ভাইবোনের মধ্যে তিনি মেজ। বাবার অভাবের সংসার, তাই লেখাপড়া করা হয়নি। ১৯৯৮ সালে বিয়ে করেন পাশের হাড়িয়ারকুঠি ইউনিয়নের কুঠিয়ালপাড়া গ্রামের তোফাজ্জল হোসেনের মেয়ে নীলুফা বেগমকে। বিয়ের পর পরিবার তাঁকে আলাদা করে দিলে সংসারে দেখা দেয় অভাব। ২০০৫ সালে কুঠিয়ালপাড়া গ্রামের এনামুল হক তাকে ধানক্ষেতে মাছ চাষের পরামর্শ দেন। এক একর জমি বর্গা নিয়ে বোরো ধানের ক্ষেতে মাছের চাষ করেন তিনি। প্রথম বছরেই ধান ও মাছ বিক্রি করে খরচ বাদে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা লাভ হয়। এরপর পুরোপুরি ধানক্ষেতে মাছ চাষ ও জমির আইলে লিচু চাষে লেগে পড়েন তিনি। প্রথম বছরের লাভের টাকা দিয়ে পরের বছরে দুই একর জমি বর্গা নেন। সেবার ধান ও ক্ষেতের মাছ বিক্রি করে আয় করেন তিন লাখ টাকা। এভাবে এক পর্যায়ে চাষের জমি বাড়ে, আয় বাড়ে। দিন মজুর থেকে গোলজার হয়ে ওঠেন সফল চাষি। কিনেন তিন একর জমি, তৈরি করেন পাকা বাড়ি। এখন তাঁর ৪ সন্তান লেখাপড়া করছে। এবার পাঁচ একর জমিতে ধানক্ষেতে মাছ চাষ করেছেন তিনি। এরমধ্যে দুই একর জমি থেকে ইতোমধ্যে প্রায় ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকার ধান ও মাছ বিক্রি করেছেন। বাকি জমি থেকে আরও ৫ লাখ টাকার বেশি আয় হবে বলে আশা করছেন। গোলজারের সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামের অনেকেই ধানক্ষেতে মাছ চাষ শুরু করেছেন। এক সময় দিনমজুর হিসেবে পরিচিত মফিজার রহমান এখন নিজের জমিতে ধান ও মাছ চাষ করছেন। আবুজার হোসেনও এই পদ্ধতিতে সফল হয়ে পুকুর, হাঁসের খামার ও গবাদিপশুর খামার গড়ে তুলেছেন। গ্রামের শিক্ষিত যুবক মজিদুল হক বাসস'কে বলেন, 'ধানক্ষেতে মাছ আর হাঁসের সমন্বিত চাষ করছি। মাছের খরচেই ধান চাষ হয়ে যায়। এতে লাভও বেশি।' গোলজার হোসেনের মতে, যে জমিতে অন্তত তিন ইঞ্চি পানি ধরে রাখা যায়, সেখানে মাছ চাষ সম্ভব। জমির চারপাশের আইল উঁচু করতে হয় এবং ধান রোপণের ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে মাছের পোনা ছাড়তে হয়। শিং, মাগুর, তেলাপিয়া, রুই, কাতলা ও সিলভার কার্প চাষে ভালো লাভ পাওয়া যায়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ধীবা রানী রায় বলেন, 'ধানক্ষেতে মাছ চাষে ধানের ফলন বাড়ে এবং কীটনাশকের ব্যবহার কমে। এতে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে।' উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান বলেন, গোলজার হোসেন এই এলাকার মডেল কৃষক। তাঁর দেখানো পথে এখন অনেকেই ধানক্ষেতে মাছ চাষ করছেন। এতে স্থানীয়ভাবে মাছের উৎপাদনও বাড়ছে। **(সূত্রঃ দৈনিক খবরপত্র, ৮ জুন ২০২৬)**

শেকৃবি গবেষকদের সাফল্য; মুরগির ক্লোয়াকায় টিকা প্রয়োগে দেড়গুণ বেশি অ্যান্টিবডি

বাংলাদেশের পোলট্রি শিল্পে গামবোরো (আইবিডি) ও রানীক্ষেত (এনডি) রোগ দীর্ঘদিন ধরে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে। এসব রোগের কারণে প্রতি বছর খামারিরা উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হন। প্রচলিত টিকাদান পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও সেগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট অঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) এক গবেষণায় এমন একটি টিকাদান পদ্ধতির সম্ভাবনা উঠে এসেছে, যা একই সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন মিউকোসাল টিস্যু ও সিস্টেমিক সঞ্চালনে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে সক্ষম। শেকৃবির অ্যানাটমি, হিস্টোলজি ও ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মাসুমের নেতৃত্বে পরিচালিত গবেষণায় মুরগির ক্লোয়াকা ভিত্তিক মিউকোসাল টিকাদান পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সাময়িকী হিলিয়নে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এই কৌশলে প্রায় ১ দশমিক

৫ গুণ বেশি অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়েছে। গবেষকদের মতে, মুরগির ক্লোয়াকা পরিপাক, মূত্র ও প্রজনন–এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার মিউকোসাল টিস্যুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে এখানে টিকা প্রয়োগ করলে শরীরের বিভিন্ন অংশে একযোগে রোগ প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে। গবেষণায় ক্লোয়াকার ল্যামিনা প্রোপ্রিয়ায় লিম্ফ্যাটিক নোডিউল ও ডিফিউজ লিম্ফ্যাটিক টিস্যুর উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে। এসব টিস্যুতে বি-লিম্ফোসাইট, টি-লিম্ফোসাইট, ম্যাক্রোফেজ ও মনোসাইটের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধক কোষ রয়েছে, যা টিকার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্লোয়াকা ভিত্তিক টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে সিস্টেমিক ও মিউকোসাল অ্যান্টিবডি উৎপাদন বাড়ানো। একই সঙ্গে আইবিডি ও এনডি রোগ প্রতিরোধে এর কার্যকারিতা যাচাই করা। গবেষণার প্রধান গবেষক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মাসুম। গবেষণা দলে আরও ছিলেন রূপা আক্তার, সুব্রত বিশ্বাস, মো. জহির উদ্দিন রুবেল, সুজন কুমার সরকার, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, হোসেন এম গোলবার, মো. ইমতিয়াজ আলম, মো. আব্দুর রকিব এবং মো. জহিরুল ইসলাম খান। গবেষণাটি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় ইমিউনোফ্লুরোসেন্স স্টেইনিং, ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি এবং এলাইজা পরীক্ষাসহ আধুনিক বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে ক্লোয়াকায় টিকা প্রয়োগের পর শরীরে উৎপন্ন অ্যান্টিবডির মাত্রা এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিবর্তন মূল্যায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পোলট্রি শিল্পে টিকা প্রয়োগের জন্য প্রধানত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। পেশীতে ইনজেকশন, স্প্রে এবং পানির সঙ্গে বা মুখে প্রয়োগ। পেশীতে ইনজেকশন মূলত সিস্টেমিক অ্যান্টিবডি তৈরি করে, স্প্রে পদ্ধতি শ্বাসতন্ত্রের মিউকোসাল প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং মুখে প্রয়োগ করা টিকা অন্ত্রের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় করে। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, ক্লোয়াকা ভিত্তিক পদ্ধতিতে শরীরের সিস্টেমিক ও মিউকোসাল উভয় ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে বারসা অব ফ্যাব্রিসিয়াসে তুলনামূলক কম ক্ষতি হওয়ায় এটিকে কম সাইটোটক্সিক বলেও উল্লেখ করেছেন গবেষকরা। তাদের মতে, বৃহৎ পরিসরে মুরগির টিকাদানে ক্লোয়াকাল রুট বিশেষ সুবিধাজনক হতে পারে। ভেন্ট সেক্সিংয়ের সময়ই টিকা প্রয়োগ করা সম্ভব হওয়ায় অতিরিক্ত হ্যান্ডলিংয়ের প্রয়োজন কমে যায়। এতে বাচ্চার ওপর চাপ কম পড়ে, শ্রম ব্যয় হ্রাস পায় এবং সময় সাশ্রয় হয়। পাশাপাশি প্রতিটি মুরগিকে সমানভাবে টিকা দেওয়া সম্ভব হওয়ায় টিকাদানের কার্যকারিতাও বাড়তে পারে। তবে প্রযুক্তিটি এখনো সব ধরনের সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে পরীক্ষা করা হয়নি। দীর্ঘমেয়াদে এর কার্যকারিতা, টিকার স্থায়িত্ব এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন বলে মনে করছেন গবেষকরা। খামার পর্যায়ে প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল, উপযুক্ত লজিস্টিক সুবিধা এবং কার্যকর টিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে বলেও তারা উল্লেখ করেছেন। গবেষকদের মতে, প্রযুক্তিটি দ্রুত মাঠপর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে গবেষণা সহায়তা বৃদ্ধি, খামারিদের প্রশিক্ষণ, নীতিগত সহায়তা এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রকল্পটির প্রধান গবেষক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মাসুম বলেন, ক্লোয়াকা-ভিত্তিক এই টিকাদান পদ্ধতি পোলট্রি শিল্পে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। এটি শুধু ব্রয়লার নয়, ভবিষ্যতে অন্যান্য পোলট্রি ও গৃহপালিত প্রাণীর ক্ষেত্রেও ব্যবহারযোগ্য হতে পারে। **(সূত্রঃ জাগো নিউজ ২৪.কম, ০৬ জুন ২০২৬)**

সমুদ্রে ৫৮ দিনে জেলেদের মাঝে ২৪ হাজার মেট্রিক টন ভিজিএফ (চাল) প্রদান

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন, উৎপাদন, সামুদ্রিক মৎস্য মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ এবং টেকসই মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করতে সরকার ১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৫৮ (আটান্ন) দিন দেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোনো প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রমের আওতায় চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ১৪টি উপকূলীয় জেলার ৬৭টি উপকূলীয় উপজেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সময় ১৪টি উপকূলীয় জেলা ও সংশ্লিষ্ট উপজেলায় ৬০টি টাস্কফোর্স কমিটির সভা, ২৬০টি সচেতনতামূলক সভা, ১২ হাজার ৬৭৮টি ব্যানার ও পোস্টার স্থাপন এবং ৬৮ হাজার ৭৫টি লিফলেট বিতরণ করা হয়। নিষেধাজ্ঞা চলাকালে বাণিজ্যিক ট্রলারের সমুদ্রযাত্রার অনুমতি বন্ধ রাখা হয় এবং বরফকলসমূহে নিয়ন্ত্রিত বরফ উৎপাদন নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া বিভাগভিত্তিক মনিটরিং কমিটি গঠন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়। নিষেধাজ্ঞাকালীন জেলেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১৪ জেলার ৬৯টি উপজেলায় ৩ লাখ ১২ হাজার ৫০০টি মৎস্যজীবী পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৫৮ দিনে মোট ২৪ হাজার ১৬৫ দশমিক ৬২৫ মেট্রিক টন ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি পরিবহন ব্যয় বাবদ ৬০ লাখ ৪১ হাজার ৪০৬ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সমন্বয়ে ৩ হাজার ৫০২টি

অভিযান এবং ৫৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। এ সময় ২ হাজার ৪৩৮টি অবতরণ কেন্দ্র, ৯ হাজার ১৫১টি মাছঘাট, ১৭ হাজার ৫৮৫টি আড়ৎ এবং ১৬ হাজার ৪৯৪টি বাজার পরিদর্শন করা হয়। অভিযানে ১ হাজার ১৯০ দশমিক ৬০ মেট্রিক টন মাছ এবং ৫৪৩ দশমিক ৪৭ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়। একইসঙ্গে ৪৮টি মামলা দায়ের, ৪৫ দশমিক ৯৪৬ লাখ টাকা অর্থদণ্ড আদায় এবং ২৬ জন জেলেকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। তাছাড়া নিলাম থেকে আয়কৃত ৬১ লাখ ৫০ হাজার ৬০০ টাকা সরকারের কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে জেলে ও যান্ত্রিক নৌযানের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এসব এলাকায় অভিযান কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে বেশি পরিচালিত হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, নৌপুলিশ, জেলা প্রশাসন এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বিত উদ্যোগে নিষেধাজ্ঞা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জেলেদের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

কৃষি ও মৎস্য খাতের উন্নয়নে জেলা প্রশাসকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের সরাসরি সংযোগ থাকায় কৃষি ও মৎস্য খাতের উন্নয়নে জেলা প্রশাসকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এ খাতগুলোর উন্নয়নে জেলা প্রশাসকদের সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। মন্ত্রী ৪ মে সোমবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৬-এ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, কৃষি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, সরকার কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে এবং নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী কৃষকদের সহায়তায় কৃষি কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড, ঋণ সুবিধা, প্রণোদনা এবং বিনামূল্যে সার, বীজ ও কীটনাশক বিতরণ কার্যক্রম চালু রেখেছে। তিনি বলেন, দেশের প্রায় ৭৫ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই কৃষকের অর্থনীতি শক্তিশালী হলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিও আরও দৃঢ় হবে। দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক মাছের আবাসস্থল ধ্বংস হওয়ায় দেশি মাছ বিলুপ্তির পথে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার গ্রামভিত্তিক মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে প্রাকৃতিকভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মানুষ সহজে মাছের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারে। কীটনাশকের অপব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ কারণে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব কীটনাশক ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে এবং এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ জোরদারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মুক্তা চাষসহ বিকল্প কৃষি উদ্যোগ সম্প্রসারণে সরকার কাজ করছে এবং এটিকে কৃষির আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও চিংড়ির পোনা উৎপাদনে দেশীয় সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে; তবে প্রয়োজনে আমদানির ক্ষেত্রে জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বিবেচনায় সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে জেলা প্রশাসকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, মাঠ প্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে জেলা প্রশাসকরাই রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত জাতীয় নির্বাচনে জেলা প্রশাসকরা দক্ষতা, সততা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিয়েছেন, যা জনগণের আস্থা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি বলেন, একসময় "মাছে-ভাতে বাঙালি" পরিচিতি থাকলেও সরকার মাছ উৎপাদনে গুরুত্ব দিচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জেলেদের সহায়তায় গৃহীত উদ্যোগের কথা তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভিজিএফ কর্মসূচির পাশাপাশি সম্প্রতি প্রায় ৪০ হাজার জেলে পরিবারকে দুই মাসের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার জন্য প্রায় ২৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশকে একটি স্থায়ী গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তিতে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব, নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালনের আহ্বান জানান। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল বারী, কৃষি সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন, খাদ্য সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানা প্রমুখ। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

দুধ উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানি নির্ভরতা কমাতে হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, বাংলাদেশে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের চাহিদাপূরণে উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি নির্ভরতা কমাতে হবে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে বিদেশে রপ্তানির সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে দুধ উৎপাদনের পরিধি বাড়াতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সোমবার ১ জুন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি)-এ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল "দুগ্ধ উৎপাদনে নারী খামারি উন্নয়নের অগ্রযাত্রা"। প্রতিমন্ত্রী বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। নারীরা শক্তিশালী হলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী হবে। দুগ্ধ খামারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বর্তমান সমাজের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দুগ্ধ খাতে নারীদের অংশগ্রহণ শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, তাদের দক্ষতা উন্নয়নে আরও প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। খামারিদের প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি সহায়তা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, একজন উদ্যোক্তা সফল হলে দেশের অর্থনীতিও উপকৃত হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, "করবো কাজ, গড়বো দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ"- এই প্রত্যয়কে ধারণ করে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে দেশকে আরও এগিয়ে নেওয়া এবং একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এর আগে প্রতিমন্ত্রী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে মাদ্রাসার এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে দুধ বিতরণ করেন। পরবর্তীতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে শুরু হয়ে খামারবাড়ি মোড় হয়ে কেআইবি প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। এ সময়ে ভেটেরিনারি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রাণিসম্পদ ভবনের সামনে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে দুধ বিতরণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। এসময় ভ্যাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. আব্দুর রহিম এবং মহাসচিব ডা. কবির উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. শাহজামান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. মো. বয়জার রহমান এবং স্বাগত বক্তব্য দেন অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. বেগম শামছুননাহার আহম্মদ। এরপর প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফডিসি) কারওয়ান বাজারস্থ প্রধান কার্যালয় আকস্মিক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কর্পোরেশনের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বর্তমান সরকারের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা অত্যন্ত বেশি। তাই কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করলে সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আরও সক্ষম হবে। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

ইউটিউব দেখে হাঁসের খামার গড়ে যুবকের সাফল্য

গ্রামীণ মেঠোপথ আর জলাশয় জুড়ে অবাধে বিচরণ করছে হাজার হাজার হাঁস। দিনাজপুরের হাকিমপুরের রিকাবি চকচকা গ্রামে ইউটিউব দেখে হাঁস পালনের আধুনিক প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের বেকারত্ব দূর করেছেন মাহফুজুর রহমান। চাকরির পেছনে না ছুটে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তিনি প্রত্যন্ত এলাকায় গড়ে তুলেছেন এক লাভজনক হাঁসের খামার। মাহফুজুর এখন এলাকার একজন সফল ও স্বাবলম্বী খামারি। দুই হাজার বাইশ সালে মাত্র একশত হাঁস নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এই খামারের যাত্রা শুরু হয়েছিল। শুরুতে অনেকেই এই উদ্যোগের সফলতা নিয়ে নানা রকম সন্দেহ প্রকাশ করলেও সঠিক পরিচর্যার কারণে তিনি আজ সফল খামারি। হাঁসের বিভিন্ন উন্নত জাত ও রোগবালাই সম্পর্কে অনলাইনের মাধ্যমে সঠিক ধারণা নিয়ে ধাপে ধাপে তিনি খামারের পরিধি বাড়িয়েছেন। প্রথমে একশত থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে বর্তমানে খামারে হাঁসের সংখ্যা শত হাজারে উন্নীত হয়েছে। প্রতিদিন সকালবেলা উঠে তিনি খামারের হাঁসগুলোর যত্ন নেন। উন্মুক্ত জলাশয় থেকে হাঁসগুলো প্রাকৃতিকভাবে শামুক, ঝিনুক, শ্যাওলা ও ছোট মাছ খেয়ে খাদ্য চাহিদা মেটানোয় কৃত্রিম ফিডের খরচ প্রায় সত্তর শতাংশ কমে গেছে। এতে হাঁসগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি খামারের উৎপাদন খরচ এক ধাক্কায় অনেক কমে এসেছে। স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে খামারে নিয়মিত প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন ও উন্নত চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। অল্প পুঁজিতে এমন লাভজনক খামার দেখে স্থানীয় অন্য সাধারণ মানুষেরাও এখন স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন এবং এই বিশাল উদ্যোগ থেকে মাহফুজুরের বছরে অন্তত পাঁচ লাখ টাকা নিট লাভ হচ্ছে। **(সূত্র: দিনোজপুর টিভি, ০৭ জুন ২০২৬)**

> **“হাঁস পালনে গড়ি সমৃদ্ধি বাড়াই দেশের অর্থকড়ি”**

রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা ভেটকি মাছ

বাংলাদেশের মৎস্যখাতে অপার সম্ভাবনার নাম ভেটকি বা কোড়াল মাছ। স্বাদু ও পুষ্টিকর এই মাছটি এখন আর কেবল নদ-নদী বা সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল নয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঘের ও পুকুরে চাষ শুরু হওয়ায় এটি দেশের নীল অর্থনীতি ছাড়িয়ে নতুন মাত্রা যোগ করছে। বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, আধুনিক হ্যাচারি প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক চাহিদার নিরিখে ভেটকি হতে পারে বাংলাদেশের পরবর্তী বড় রপ্তানি পণ্য। এই কাজটি করছে দেশের একমাত্র ভেটকি হ্যাচারি গ্রীন হাউস মেরিকালচার। যেটি কক্সবাজারের কলাতলিতে অবস্থিত। মৎস্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লোনা, আধা-লোনা ও স্বাদু পানিতে ভেটকি চাষের বিশাল সুযোগ রয়েছে। আগে জেলেরা প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করে চাষ করত, যা ছিল অনিয়মিত। বর্তমানে আধুনিক নিবিড় ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ হওয়ায় প্রতি হেক্টরে উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়েছে। ভেটকি চাষের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি দ্রুত বর্ধনশীল। সঠিক ব্যবস্থাপনায় একটি পোনা এক বছরে ১ থেকে ২ কেজি পর্যন্ত ওজন হতে পারে। স্থানীয় বাজারে প্রতি কেজি বড় ভেটকির দাম ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারেও রয়েছে এ মাছের ব্যাপক চাহিদা। উৎপাদন খরচ ও মুনাফার অনুপাত বিবেচনায় এটি গলদা বা বাগদা চিংড়ির চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে লাভজনক হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক উৎসের পোনার ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে বাংলাদেশ এখন কৃত্রিম প্রজননে সফল হয়েছে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত ‘স্পেসিফিক প্যাথোজেন ফ্রি’ পোনা চাষের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। আর বাংলাদেশে এটি সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কাজটি করছে ভেটকি হ্যাচারি গ্রীন হাউস মেরিকালচার। দেশে ব্যাপক চাহিদা তৈরির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে সারা দেশে মৎস্যচাষীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। হ্যাচারির পোনা সমজাতীয় আকারের হয়, ফলে এদের বৃদ্ধি সমানভাবে ঘটে এবং নরম মাংসভোজী স্বভাবের কারণে ছোট মাছকে বড় মাছের খেয়ে ফেলার হার কমে যায়। প্রাকৃতিক পোনার তুলনায় হ্যাচারির পোনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। আধুনিক হ্যাচারিগুলোতে এখন ৯০ শতাংশ পর্যন্ত

পোনা টিকে থাকার হার নিশ্চিত করা যাচ্ছে। প্রাকৃতিক পোনা কেবল নির্দিষ্ট মৌসুমে পাওয়া যায়, কিন্তু হ্যাচারি প্রযুক্তির কারণে এখন কৃষক নিজের সুবিধামতো সময়ে চাষ শুরু করতে পারছেন। এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মাহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. জিয়া হায়দার চৌধুরী বলেন, নানা কারণে চিংড়ির উৎপাদন ও রপ্তানি কিছুটা মন্থর হলেও ভেটকি বা কোড়াল মাছের চাহিদা বিশ্বব্যাপী। এখন আর এটি শুধু লোনা পানির মাছ নয়। সব ধরণের পানিতেই চাষের উপযোগী। আমাদের দেশে আগে প্রাকৃতিক উৎস থেকেই এ মাছের পোনা সংগ্রহ করা হলেও এখন কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব। বছরের প্রায় সময়েই এ পোনা মজুদ করা যায়। ফলে যে কেউ চাইলেই পরিকল্পিতভাবে ভেটকি মাছ চাষ করতে পারেন। চাহিদা ও পোনা স্বল্পতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সারাদেশে আমাদের মৎস্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ভেটকি চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। বর্তমানে উপকূলীয় সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ও কক্সবাজার জেলায় প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে ভেটকি চাষ হচ্ছে। এখন পর্যন্ত যা চাহিদা তা প্রাকৃতিক ও একটি হ্যাচারির মাধ্যমে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। তবে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে আগ্রহীদের ভেটকি পোনা উৎপাদনে হ্যাচারির অনুমোদন দেওয়া হবে। কক্সবাজার থেকে পোনা পরিবহণে পুলিশি হয়রানি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা ঠিক যে কক্সবাজার থেকে পণ্য পরিবহণে কিছুটা পুলিশি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তার পরেও মাছের পোনা পরিবহণে যাতে করে কোনো সমস্যা না হয়। সে বিষয়ে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসকের সহায়তা পাওয়া যাবে বলেও জানান মহাপরিচালক। কক্সবাজারের জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. নাজমুল হুদা বলেন, আমাদের দেশেও সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন হোটেলে ভেটকি মাছের চাহিদা রয়েছে। চাহিদা বেশি থাকায় দামও বেশি। দেশে অপার সম্ভাবনা রয়েছে এই মাছের। এই মাছ এক বছরে এক থেকে ২ কেজি ওজন হয়ে থাকে। তবে সমস্যা হলো, আমদানি নির্ভর মাছের খাদ্য। এ কারণে খাদ্য মূল্য একটু বেশি। অনেকে একারণে আগ্রহ কম দেখাচ্ছেন। তবে সরকারের পক্ষ থেকে সারাদেশে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক একর পুকুরে নিবিড় পদ্ধতিতে ভেটকি চাষ করে বছরে ১০-১৫ লাখ টাকা মুনাফা করা সম্ভব, যা প্রচলিত মাছ চাষের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববাজারে ভেটকি বা 'এশিয়ান সি-বাস' বা বারামুন্ডি এর চাহিদা আকাশচুম্বী। বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এই মাছের নিয়মিত বাজার রয়েছে। ভেটকির সাদা মাংস, কাঁটা কম হওয়া এবং 'ফিলেট' তৈরির উপযোগী হওয়ায় এটি আন্তর্জাতিক ফুড চেইন ও ফাইভ স্টার হোটেলগুলোর প্রথম পছন্দ। এছাড়াও এ মাছে উচ্চ ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের উপস্থিতি একে স্বাস্থ্য সচেতন বিদেশিদের কাছে জনপ্রিয় করেছে। থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও ভারত ইতিমধ্যে ভেটকি রপ্তানিতে বড় জায়গা করে নিয়েছে; বাংলাদেশও এখন সেই পথে হাঁটছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থার তথ্যমতে, বাংলাদেশে ভেটকির উৎপাদন গত পাঁচ বছরে উর্ধ্বমুখী। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে মোট ভেটকির উৎপাদন ছিল প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় ৭০ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমানে উপকূলীয় সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ও কক্সবাজার জেলায় প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে ভেটকি চাষ হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে ভ্যালু-অ্যাডেড পণ্য হিসেবে ভেটকি রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ 'বি' ক্যাটাগরি থেকে 'এ' ক্যাটাগরিতে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছে। একমাত্র হ্যাচারি গ্রীন হাউস মেরিকালচারের ম্যানেজার মাহমুদুল হক বলেন, সরকারি অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায় ২০২০ সাল থেকে এই হ্যাচারি ভেটকি নিয়ে গবেষণা করছে। ২০২৩ সাল থেকে ভেটকির পোনা উৎপাদন শুরু করে। শুরুতে পোনা বেঁচে থাকার হার কম থাকলেও এখন কিছুটা বেড়েছে। তবে পোনা উৎপাদনে যে পরিমাণ ডিম ছাড়ে তার থেকে ২০-৫০ শতাংশ পোনা উৎপাদন হয়ে থাকে। প্রতি বছর প্রায় ২০-৫০ লাখ পোনা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তবে পোনার আকার ভেদে দাম নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আগে প্রাকৃতিক পোনার ক্ষেত্রে মৃত্যুহার ছিল ৪০-৫০ শতাংশে, যা আধুনিক হ্যাচারি পোনার ক্ষেত্রে মাত্র ৫-১০ শতাংশে নেমে এসেছে। রোগমুক্ত উৎপাদন: হ্যাচারিতে কঠোর বায়োসিকিউরিটি মেইনটেইন করায় পোনাগুলো ভাইরাসমুক্ত থাকে, যা বাণিজ্যিকভাবে ঝুঁকি কমায়। সমস্যা বিষয়ে তিনি বলেন, মাদকপ্রবণ এলাকা হওয়ার কারণে পোনা পরিবহন করা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হয়। পরিবহণ মালিকরাও পোনা পরিবহন করতে চায় না। এবিষয়ে সরকারি সহায়তা প্রয়োজন বলেও তিনি মনে করেন। তিনি আরো বলেন, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা থাকলেও ফিড বা খাবারের উচ্চমূল্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ভেটকি শিকারি মাছ হওয়ায় একে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হয়। দেশে মানসম্মত ফিড মিল স্থাপন এবং পোনা সহজলভ্য করতে পারলে উৎপাদন খরচ ৩০শতাংশ কমানো সম্ভব। এছাড়া সরকারিভাবে 'ক্লাস্টার ফার্মিং' বা গুচ্ছ চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা প্রয়োজন। মৎস্য অধিদপ্তর ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫২ হাজার মে.টন উৎপাদন হলেও ১ হাজার ২০০ মে.টন রপ্তানি করে আয় হয়েছে ১৬৫ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছর ৫৮ হাজার মে.টন উৎপাদন হলেও ১৬৫০ মে.টন রপ্তানি করে আয় হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছর ৬৫ হাজার ৫০০ মে.টন উৎপাদন হলেও ২ হাজার ১০০ মে.টন রপ্তানি করে আয় হয়েছে ২২০ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছর ৭৫ হাজার মে.টন উৎপাদন ও ৩৫০০ মে.টন রপ্তানির মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে। **(সূত্র: ভোরের ডাক, ১৫ মে ২০২৬)**

**"মাছ খেলে বাড়ে বল
সুস্থ থাকবে মনোবল"**

আগামীতে অর্গানিক মাংস রপ্তানি করবে বাংলাদেশ : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, কোন প্রকার জিনেটিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে প্রাকৃতিক ও পুষ্টিসম্পন্ন ঘাস গবাদিপশুকে প্রদানের মাধ্যমে উৎপন্ন মাংস আগামী তিন বছরের মধ্যে রপ্তানি করবে বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এবং অস্ট্রেলিয়ার চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটি (সিএসইউ)-এর যৌথ উদ্যোগে এবং অস্ট্রেলিয়া সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্সের অর্থায়নে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে "অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ রিসার্চ শোকেস" শীর্ষক একটি সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "জলবায়ু সহনশীল খাদ্য ব্যবস্থা-ব্যবহারিক সমাধান ও অংশীদারিত্ব"। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিশ্বে নিরাপদ খাদ্য ও নিউট্রেশনাল ফুড খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। জেনেটিক মোডিফাইড ফুড পৃথিবীকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে পারেনি। গবেষণার মাধ্যমে নেপিয়ার ঘাসের এমন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা ১৮% শতাংশ প্রোটিন সম্পন্ন। মন্ত্রী আরো বলেন, গবাদিপশুর জন্য উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ ও খরা-সহিষ্ণু ঘাস উদ্ভাবন প্রাণিসম্পদ খাতে এক যুগান্তকারী অগ্রগতি, যা স্বল্প ব্যয়ে উন্নতমানের প্রাণিখাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর ফলে মাংস উৎপাদন ব্যয় কমবে এবং সাধারণ মানুষের জন্য মাংসের দামও তুলনামূলকভাবে সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে। মন্ত্রী গবেষক ও বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশের কল্যাণে স্বাধীনভাবে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন আগামী দিনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পাবে এবং দেশের প্রাণিসম্পদ ও কৃষি খাতকে আরও সমৃদ্ধ করবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, গবাদিপশুর খাদ্য উৎপাদন ব্যয় কমানো গেলে মাংস উৎপাদনের খরচও কমবে এবং তা ভোক্তাদের কাছে তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। কম খরচে উন্নতমানের ঘাস ও প্রাণিখাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে গবেষণা ও প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন চিন্তা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, যাতে গবেষকরা দেশের কল্যাণে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন। তিনি আরো বলেন, গণতান্ত্রিক সমাজে মতভিন্নতা স্বাভাবিক হলেও যোগ্যতা, দক্ষতা ও দেশপ্রেমকে মূল্যায়ন করে দেশের উন্নয়নে কাজ করাই হওয়া উচিত প্রধান লক্ষ্য। বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাই কমিশনার ক্লিনটন পবকি উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. শাহজামান খান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএলআরআই-এর পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. জিল্লুর রহমান এবং চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও গুলবালি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক ড. ক্যামেরন ক্লার্ক। সেমিনারে পরিবেশবান্ধব ও স্বল্প ব্যয়ী গরুর মাংস উৎপাদন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং টেকসই প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে "এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল লো-কস্ট বিফ প্রোডাকশন-প্র্যাকটিক্যাল সলুশনস অ্যান্ড পার্টনারশিপ" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএলআরআই-এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. মোহাম্মদ খায়রুল বাশার। প্রবন্ধে প্রাণিসম্পদ খাতে গ্রীনহাউস গ্যাস ও মিথেন নিঃসরণ হ্রাসে করণীয় বিষয়ও তুলে ধরা হয়। গবেষকদের মতে, উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনা, সবুজ ঘাস উৎপাদন বৃদ্ধি, বায়োগ্যাস প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্বন ব্যালেন্সিং পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব প্রাণিসম্পদ খাত গড়ে তোলা সম্ভব। মূল প্রবন্ধের ওপর উন্মুক্ত আলোচনায় সেমিনারে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় টেকসই ও স্বল্প খরচে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, গবেষক, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, প্রাণিসম্পদ খাতের পেশাজীবী, উন্নয়ন সহযোগী, বিএলআরআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং খামারিরা অংশ নেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

"দেহ গড়ার মূল উপাদান মাংস তার সেরা প্রমাণ"

জেলেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, জাটকা রক্ষা করা গেলে দেশে ইলিশের উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে, যার প্রকৃত সুফল জেলেরাই ভোগ করবেন। আজ বিকেলে লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে ইলিশ অভয়াশ্রমে মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন জেলেদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃষি ঋণ মওকুফ ও ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে জেলেদের সংকটকালীন সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে এই মুহূর্তের অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে দেখছে মন্ত্রণালয়।' জেলেদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আপনাদের সবার খোঁজখবর রাখেন। আপনারা পর্যায়ক্রমে সবাই 'ফ্যামিলি কার্ড' পাবেন, কেউ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না। জেলেদের তালিকাভুক্তির কাজ চলছে; যারা এখনো বাদ পড়েছেন, তাদের দ্রুত এই তালিকার আওতায় আনা হবে।' প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, 'বর্তমানে আমরা ৪০ হাজার পরিবারকে সরকারি সহায়তার আওতায় এনেছি। অতীতে এই সহায়তায় শুধু চাল দেওয়া হলেও, বর্তমান প্রকল্পের আওতায় খাদ্যসামগ্রীর পরিধি বাড়ানো হয়েছে। তিনি সহায়তার বিবরণ দিয়ে বলেন, দুই মাসের জন্য প্রতিটি পরিবারকে ১২ কেজি আটা, ১০ লিটার তেল, ৮ কেজি মসুর ডাল, ৪ কেজি চিনি, ৪ কেজি লবণ ও ১৬ কেজি আলু দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ইতোমধ্যে ৮০ কেজি ভিজিএফ চাল বিতরণ করা হয়েছে এবং আরও ৮০ কেজি চাল পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'জেলেদের আগের তালিকায় অনেক ত্রুটি ছিল, যা আমরা নতুন করে প্রণয়ন করেছি। অতীতে চাল বিতরণে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও এবার আমরা সার্বক্ষণিক তদারকি করছি। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়া আমাদের সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদমন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এমপি। জেলা প্রশাসক এস এম মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য আবুল খায়ের ভূঁইয়া, লক্ষ্মীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য শাহাদাত হোসেন সেলিম, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জিয়া হায়দার চৌধুরী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. হেমায়েত হোসেন, পুলিশ সুপার মো. আবু তারেক এবং জেলা পরিষদের প্রশাসক সাহাব উদ্দিন সাবুসহ অন্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

পাঁচ হাজার টাকা পুঁজিতে মুরগির খামার করে সফল তরুণ উদ্যোক্তা

সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় খেলার মাঠের আনন্দ বাদ দিয়ে মাত্র ৫ হাজার টাকা পুঁজিতে মুরগির খামার শুরু করেছিলেন এক রাজমিস্ত্রীর সন্তান। দীর্ঘ সাড়ে সাত বছরের কঠোর পরিশ্রম আর একাগ্রতায় সেই ছোট উদ্যোগ আজ এক বিশাল বাণিজ্যিক প্রকল্পে রূপ নিয়েছে। অভাবের দিনগুলোকে জয় করে এই তরুণ বয়স বাড়ার আগেই নিজেকে একজন সফল পোল্ট্রি ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি এখন একাধিক খামার ও নিজস্ব হ্যাচারির সফল মালিক। শুরুর গল্পটা ছিল ৮শত সোনালী মুরগি নিয়ে, যেখানে মূলধনের সংকটে ডিলারদের কাছ থেকে বাকিতে বাচ্চা ও ফিড সংগ্রহ করতে হতো। প্রথমদিকে তিনশত টাকা লোকসান হলেও দমে না গিয়ে ব্যবসা ধরে রাখার অনড় মানসিকতা তাকে আজ এই অবস্থানে এনেছে। একসময় যার বাবা অন্যের অধীনে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন, আজ সেই বাবা ছেলের খামারে শ্রম দিচ্ছেন এবং তাদের অধীনে আরও বেশ কয়েকজন কর্মচারীর কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। খামারের কাজের পাশাপাশি নিজের দক্ষতা বাড়াতে তিনি পশুপালন বিষয়ের ওপর একটি চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সও সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে এই তরুণ খামারির অধীনে তিনটি বড় সেট রয়েছে, যেখানে ২ হাজার লেয়ার, ৩ হাজার কালার বার্ড এবং ১ হাজার ব্রয়লার মুরগি রয়েছে। এর পাশাপাশি ১০ হাজার ধারণক্ষমতার একটি আধুনিক হ্যাচারি এবং স্থানীয় খামারিদের আপদকালীন সহায়তার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা খোলা রাখা ফিড ও ওষুধের ব্যবসা পরিচালনা করছেন তিনি। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি গভীর রাতে মুরগির

যেকোনো জরুরি সমস্যায় নিজে ওষুধপত্র নিয়ে খামারে ছুটে যান এই তরুণ। পোল্ট্রি বাজারের ওঠানামার কারণে মাঝে মাঝে ব্যবসায় লাভ-লোকসান হলেও দীর্ঘমেয়াদে এই খাতকে আরও বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। এলাকার মানুষ ও বড় ভাইয়েরা তার এই অল্প বয়সের অভাবনীয় সামর্থ্য ও বড় ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতা দেখে তাকে বেশ ভালোবাসেন। সততার সাথে ব্যবসা প্রসারিত করে ভবিষ্যতে আরও অনেক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করতে চান এই অদম্য তরুণ উদ্যোক্তা। **(সূত্রঃ দিনাজপুর টিভি, ৬ জুন ২০২৬)**

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হতে হবে কৃষক ও খামারির কল্যাণ নিশ্চিত করা : মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হতে হবে কৃষক, খামারি ও উৎপাদকের কল্যাণ নিশ্চিত করা। শুধু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ নয়, বরং বাস্তব উপকারভোগীদের জীবনমান উন্নয়ন এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। মঙ্গলবার ১৬ জুন ২০২৬ সাভারে বাংলাদেশ ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)-এর সমাপনী কর্মশালা এবং নবনির্মিত বাংলাদেশ ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, দেশের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো উৎপাদকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা। কৃষক যদি তার উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য না পান, তাহলে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, দেশে উৎপাদন ও বাজারের চাহিদার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। উৎপাদক অনেক সময় জানেন না কোথায় কী পরিমাণ চাহিদা রয়েছে, আবার ভোক্তার কাছেও উৎপাদিত পণ্য সময়মতো পৌঁছায় না। এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগীরা লাভবান হলেও কৃষক ও খামারিরা বঞ্চিত হন। এ ব্যবধান কমিয়ে উৎপাদক ও বাজারের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সরকার কাজ করবে। গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য গবেষণায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। গবেষণা ছাড়া উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন সম্ভব নয়। এ কারণে সরকার ভবিষ্যতে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতে গবেষণা কার্যক্রমে আরও বেশি বিনিয়োগ করবে। দেশে উৎপাদিত ভ্যাকসিনের ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, যেসব ভ্যাকসিন দেশে উৎপাদন সম্ভব, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হবে। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী ও প্রকল্পসংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্যে বলেন, জনগণের অর্থে পরিচালিত প্রতিটি প্রকল্পের সুফল যেন সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। মাঠপর্যায়ের বাস্তব সমস্যা চিহ্নিত করে কার্যকর সমাধান দিতে পারলেই দেশের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাত আরও এগিয়ে যাবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. শাহজামান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত সচিব মোঃ ইমাম উদ্দীন কবীর এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. শাহীন আরা বেগম, পিএএ। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)-এর প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোস্তফা কামাল মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এর আগে মন্ত্রী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন বাস্তবায়নাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)-এর আওতায় নির্মিত বাংলাদেশ ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ভবনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, মিল্ক ভিটার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, দুগ্ধ প্রসেসরের প্রতিনিধিবৃন্দ, ডেইরি হাবের প্রতিনিধিবৃন্দ, পিজি খামারিবৃন্দ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

প্রাণিসম্পদ খাতকে সমৃদ্ধ করতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার

মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব। বুধবার ১৩ মে ২০২৬ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত "লাইভস্টক সার্ভিস ট্রান্সফরমেশন (এলএসটি) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বিষয়ক ভ্যালিডেশন কর্মশালা"-তে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রাণিসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই প্রাণীদের যথাযথ পরিচর্যা ও সেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, সরকার প্রাণিসম্পদ খাতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং এ খাতের উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাণিসম্পদ খাতের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে রোগ নির্ণয়, উন্নত ক্লিনিক ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত জনবলের প্রয়োজন রয়েছে। এ খাতকে আধুনিক ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ এবং যথাযথ বাজেট বরাদ্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তীতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও এ খাতকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রাণিসম্পদ খাতকে এগিয়ে নিতে আন্তরিকভাবে কাজ করছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাত দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এবং একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, প্রাণিসম্পদ খাতকে রপ্তানিমুখী খাতে পরিণত করতে হবে এবং এ জন্য প্রকল্পের পরিধি ও বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। তিনি বলেন, দেশের পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রাণিসম্পদ খাতের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ খাতকে আরও অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. শাহজামান খান বলেন, প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করাই প্রাণিসম্পদ খাতের মূল ভিশন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জন্য বিশ্ববাজারে হালাল পণ্য রপ্তানির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে আরও শক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সক্ষম। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এলএসটি প্রকল্পের টিম লিডার ড. মো. মুশফিকুর রহমান, স্বাগত বক্তব্য দেন প্রকল্প পরিচালক ড. রেজাউল হক খান। এসময় মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

"জীববৈচিত্র্য রক্ষা করি
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করি "

১টি গরু থেকে ফারিয়ার ৬০টি গরুর খামার

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার নারী উদ্যোক্তা ফারিয়া আক্তার ইলা এখন এলাকায় সফল খামারি হিসেবে পরিচিত। ২০২২ সালে মাত্র একটি গরু পালন দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে তার "ফাহিয়ান অ্যাগ্রো ফার্ম"-এ রয়েছে ৬০টিরও বেশি গরু। আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশীয় পদ্ধতিতে লালন-পালন করে প্রস্তুত করা হয়েছে কোরবানির পশু। জানা গেছে, ছোট পরিসরে গরু পালন শুরু করার পর ধীরে ধীরে খামার গড়ার স্বপ্ন দেখেন ফারিয়া আক্তার ইলা। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস পরিশ্রম ও পরিবারের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন "ফাহিয়ান অ্যাগ্রো ফার্ম"। বর্তমানে তার খামারে শাহিওয়াল, ফাইটার, ওয়েস্টার্ন ফ্রিজিয়ানসহ বিভিন্ন জাতের গরু রয়েছে। খড়কুটো, ঘাস ও দানাদার খাবার খাইয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে গরুগুলো মোটাতাজা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। গরুর খামারের পাশাপাশি তিনি ছাগল পালন, কবুতর পালন এবং মাছ চাষও করছেন। ফারিয়া আক্তার ইলা বলেন,"খামারের পশুগুলো সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে লালন-পালন করা হচ্ছে। কোনো ক্ষতিকর উপায়ে মোটাতাজাকরণ করা হয় না। ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।" তার এই সফলতার পেছনে স্বামী মো. সুমন খানের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন তিনি। ফারিয়া জানান, শুরু থেকেই তার স্বামী সাহস ও সহযোগিতা দিয়ে পাশে ছিলেন। ফলে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পেয়েছেন। বর্তমানে ফাহিয়ান অ্যাগ্রো ফার্মে এলাকার কয়েকজন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, একসময় যারা ফারিয়া আক্তার ইলাকে নিয়ে সমালোচনা করতেন, এখন তারাই তার সফলতায় প্রশংসা করছেন। নারী হিসেবে তার এই উদ্যোগ এলাকায় অন্যদের জন্যও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। স্বপ্ন, সাহস ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে একজন নারী উদ্যোক্তার সফল হয়ে ওঠার অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছেন রাজাপুরের ফারিয়া আক্তার ইলা। রাজাপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, "ফারিয়া আক্তার ইলা একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। তিনি কোরবানির জন্য দেশীয় পদ্ধতিতে তার খামারে গরু লালন-পালন করে মোটাতাজা করেছেন। আমরা তাকে সব সময় পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আসছি।" **(সূত্রঃ সময়ের আলো, ১৯ জুন ২০২৬)**

চিতল মাছ চাষ যেভাবে লাভজনক হতে পারে

কার্প জাতীয় মাছের সঙ্গে মিশ্রভাবে চাষ করা যায় চিতল মাছ। কেননা চিতল মাছ চাষ অত্যন্ত লাভজনক। এমনকি এ মাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া মিশ্র চাষে এ মাছের রোগবালাই নেই। ফলে খুব সহজেই চিতল মাছ চাষ আপনার জন্য লাভজনক হতে পারে। তবে এর জন্য কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। চাষে করণীয় প্রতি শতাংশে ৫-৬টি চিতল মাছের পোনা ছাড়তে হবে। চিতল মাছ যেহেতু ছোট ছোট মাছের পোনা খেয়ে বেঁচে থাকে, তাই চিতল মাছের কালচার পুকুরে খাবারের জন্য তেলাপিয়া মাছের ব্রুড মাছ ছাড়তে হবে। একটি চিতলের বিপরীতে ৫-৭টি তেলাপিয়া মাছের ব্রুড ছাড়তে হবে। চাষপদ্ধতি ৩-৬ ইঞ্চি সাইজের চিতল মাছ কালচার পুকুরে ছাড়তে হবে। প্রতি শতাংশে ৫টি চিতল মাছ ছাড়লে এর জন্য ৩৫-৪০টি তেলাপিয়া মাছের ব্রুড ছাড়তে হবে। তেলাপিয়া মাছ বাচ্চা দেবে আর চিতল মাছ সেগুলো খাবে। রুই-কাতল মাছের সঙ্গেও চিতল মাছ চাষ করা যাবে। এ মাছ চাষের জন্য বড় পুকুর, ঘের বা বিল নির্বাচন করতে হবে। কারণ যত বড় জায়গা হবে তত লাভ হবে। বড় জায়গায় মাছ দ্রুত বাড়ে এবং লাভ বেশি হয়। একটি চিতল মাছ বছরে কমপক্ষে ২-৩ কেজি ওজন হয়। রোগবালাই চিতল মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই মিশ্র চাষে রোগবালাই নেই বললেই চলে। কিছু পরামর্শ পুকুরের পাড় ভালো হতে হবে, যাতে বর্ষা মৌসুমে ডুবে না যায়। বিকল্প পানি সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ মাছ রাক্ষুসে স্বভাবের হলেও বড় মাছ খায় না। কেবল ছোট ছোট মাছের পোনা খেয়ে থাকে। চিতল মাছের খামারে পর্যাপ্ত ছোট মাছ নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে মাছ বড় হবে না। খামারে ছোট ছোট মাছের ঘাটতি হলে আলাদা রুই বা মৃগেল মাছ নার্সারি করে খাদ্য হিসেবে দিতে হবে। নিজের মাছের ঘের না থাকলে ভাড়া নিয়ে মাছ চাষ করতে পারেন। সঠিক জাতের সুস্থ চিতল মাছের পোনা মজুত করুন। ভালো হ্যাচারি থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ করে লাভবান হতে পারেন। **(সূত্রঃ জাগো নিউজ ২৪.কম, ১৪ মে ২০২৬)**

পুষ্টি, অর্থনীতি ও নারী খামারির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের দুগ্ধখাত

একটি উন্নত, দক্ষ ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো নিরাপদ খাদ্য ও পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি, মেধা বিকাশ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সুস্থ মানবসম্পদ গঠনে প্রাণিজ আমিষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রাণিজ খাদ্যের মধ্যে দুধকে ধরা হয় সবচেয়ে পুষ্টিগুণসম্পন্ন ও সহজলভ্য খাদ্যগুলোর একটি। এ কারণেই দুধ কেবল একটি খাদ্য নয়, বরং পুষ্টি নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জীবিকার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত একটি খাত। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ প্রাণিসম্পদসমৃদ্ধ দেশ। এক লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দেশে মোট গৃহপালিত প্রাণীর সংখ্যা প্রায় ৪৬৪.৬৩ মিলিয়ন। অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় গড়ে ৩ হাজারেরও বেশি গবাদি ও গৃহপালিত প্রাণী লালন-পালন করা হয়, যেখানে বিশ্ব গড় প্রায় ২৯টি। সীমিত ভূমি ও বিপুল জনসংখ্যার দেশে এই প্রাণিসম্পদ একদিকে যেমন ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, অন্যদিকে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বারও উন্মোচন করেছে। সরকার "সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ" ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, বাংলাদেশে গরুর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৫২ লাখ, মহিষ ১৫ লাখের বেশি, ছাগল প্রায় ২ কোটি ৭৩ লাখ, ভেড়া প্রায় ৪০ লাখ, মুরগি প্রায় ৩৩৬ কোটি এবং হাঁস ৭০ কোটিরও বেশি। এই বিশাল প্রাণিসম্পদ দেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৬৯-৭০ সালে দেশে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬ দশমিক ২৭ লাখ টন, ১ দশমিক ২৭ লাখ টন এবং ৩৫ দশমিক ৩ কোটি। বিপরীতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দুধ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৫ দশমিক ৩৮ লাখ মেট্রিক টনে, মাংস ৮৯ দশমিক ৫৪ লাখ মেট্রিক টনে এবং ডিম উৎপাদন ২,৪৪০ দশমিক ৬৫ কোটিতে। বর্তমানে মাথাপিছু মাংস উৎপাদন

দৈনিক ১৩৭ দশমিক ৯০ গ্রাম এবং ডিম উৎপাদন বছরে ১৩৭ দশমিক ১৯টি, যা জাতীয় চাহিদার তুলনায় বেশি। দুধ উৎপাদনও মাথাপিছু ২৩৯ দশমিক ২৯ মিলিলিটারে পৌঁছেছে, যা কাঙ্ক্ষিত ২৫০ মিলিলিটারের খুব কাছাকাছি। অর্থাৎ বাংলাদেশ দুধ উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে। বিশ্বব্যাপী দুধের গুরুত্ব তুলে ধরতে প্রতিবছর ১ জুন পালিত হয় বিশ্ব দুগ্ধ দিবস। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ২০০১ সাল থেকে দিবসটি পালন করে আসছে। এ বছরের বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য "সেলিব্রেটিং উইমেন ফার্মার্স", যার আলোকে বাংলাদেশে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-"দুগ্ধ উৎপাদনে নারী খামারি, উন্নয়নের অগ্রযাত্রা"। এ প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ নারী খামারিদের অবদানকে বিশেষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের দুগ্ধখাতে নারীদের অবদান দিন দিন দৃশ্যমান হচ্ছে। গ্রামের অসংখ্য নারী গাভী পালন, দুধ সংগ্রহ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাছুর পরিচর্যা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে খামার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। অনেক পরিবারে নারীদের আয় পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে এবং শিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টি ব্যয়ে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ফলে দুগ্ধখাত কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, নারী ক্ষমতায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তবে অগ্রগতির পাশাপাশি চ্যালেঞ্জও কম নয়। দেশে দুধের চাহিদা প্রায় ১৫.৮৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন হলেও সরবরাহ প্রায় ১৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। মাথাপিছু দুধ গ্রহণ বর্তমানে প্রায় ১২০ মিলিলিটার, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত ২৫০ মিলিলিটারের তুলনায় কম। চাহিদা পূরণে বাংলাদেশকে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গুঁড়া দুধ আমদানি করতে হয়, যা বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে খামারিরা ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার অভিযোগ করেন, আবার ভোক্তারা উচ্চমূল্যের কথা বলেন। খাঁটি দুধের অভাব, পশুখাদ্যের উচ্চমূল্য, রোগব্যাধি, সংরক্ষণ ও শীতলীকরণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সংকরায়নের মাধ্যমে উন্নত জাতের গবাদিপশু সম্প্রসারণ, সবুজ ঘাস চাষ, রোগ প্রতিরোধ, প্রযুক্তিনির্ভর খামার ব্যবস্থাপনা এবং ডেইরি হাব ও গ্রামীণ দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) উচ্চ ফলনশীল ঘাস, উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করছে। বিএলআরআইয়ের গবেষণায় দেখা গেছে, নেপিয়ার ঘাসভিত্তিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে দুধ উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। প্রায় ১ কেজি নেপিয়ার ড্রাই ম্যাটার খাইয়ে ১ কেজি দুধ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলক কম। গবেষণার ফলাফল বলছে, দেশীয় জাতের গরু ও মহিষের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে খামারির আয় বাড়ানো এবং দেশের দুধ উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। দেশীয় জাত উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। বাংলাদেশের প্রথম দেশীয় স্বীকৃত গরুর জাত রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি)-এর গড় দুধ উৎপাদন প্রতিদিন ২.৫ লিটার থেকে ৪.৫ লিটারে উন্নীত হয়েছে। বিসিবি-১ (পাবনা) জাতের গরুর ক্ষেত্রেও দুধ উৎপাদন বেড়েছে। দেশি মহিষের দৈনিক দুধ উৎপাদন ২-৩ লিটার থেকে ৪-৫ লিটারে উন্নীত করার ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম ইতিবাচক ফল দিচ্ছে। উন্নত প্রজনন প্রযুক্তি ও ফ্রোজেন সিমেন ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগও চলমান রয়েছে। পুষ্টিগুণের বিচারে দুধ এক অনন্য খাদ্য। গরুর পূর্ণ চর্বিযুক্ত দুধে রয়েছে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ভিটামিন এ, ডি ও বি-১২-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। হাড় ও দাঁত মজবুত করা, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি, মস্তিষ্কের বিকাশ, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং সুস্থ ঘুম নিশ্চিত করতেও দুধ সহায়ক ভূমিকা রাখে। শিশু, কিশোর, গর্ভবতী নারী এবং প্রবীণদের জন্য দুধ বিশেষভাবে উপকারী। বাংলাদেশে দুগ্ধখাত শুধু পুষ্টির নয়, অর্থনীতিরও একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। লক্ষ লক্ষ মানুষ গবাদিপশু পালন, দুধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা এবং নারী খামারিদের স্বাবলম্বী করতে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একইসঙ্গে দুধভিত্তিক শিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থানও বাড়ছে। বিশ্ব দুগ্ধ দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, দুধ শুধু একটি পানীয় নয়; এটি পুষ্টি, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি শক্তিশালী ভিত্তি। উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, নারী খামারিদের ক্ষমতায়ন, প্রযুক্তি ও গবেষণার সম্প্রসারণ এবং বাজারব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুগ্ধখাত আরও শক্তিশালী হতে পারে। সম্মিলিত উদ্যোগ ও কার্যকর সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে অচিরেই দেশ দুধ উৎপাদনে পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্য অর্জন করবে- এমন প্রত্যাশা এখন সময়ের দাবি। সরকারও এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)**

সামুদ্রিক মাছের পটকা, পাখনায় বাড়ছে রপ্তানি

চট্টগ্রাম উপকূলে একসময় অবহেলিত লাক্কা মাছ ও সামুদ্রিক কোরাল এখন আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি করেছে নতুন সম্ভাবনা। বিশেষ করে এই মাছের পটকা (সুইম ব্লাডার) ও পাখনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে লাভজনক রপ্তানি বাণিজ্য, যা জেলেদের আয়ে এনেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাটের মাছ ব্যবসায়ী ও জেলেরা জানান,আগে সামুদ্রিক মাছ লাক্কা সহ অন্য বড় আকারের মাছ ধরা পড়লেও এর পটকা ও পাখনা তেমন কাজে লাগানো

হতো না। অনেক সময় সেগুলো ফেলে দেওয়া হতো। কিন্তু কয়েক বছর ধরে বিদেশে চাহিদা বাড়ায় এখন এসব অংশ আলাদাভাবে সংগ্রহ করে উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। ব্যবসা সংশ্লিষ্টরা জানান, গভীর সমুদ্রে একসময় ব্লু শার্ক, টাইগার শার্ক, হেমারহেড শার্ক, কালা হাঙরসহ ১০ প্রজাতির হাঙর পাওয়া গেলেও এখন সেই পরিমাণে নেই। আর এই ধরনের মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা থাকায় বর্তমানে হেমারহেড হাঙর মূলত রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজারে গোপনে বিক্রি হয়। তাই লাক্কা, কোরাল লাল পোয়া, বোয়াল পাঙ্গাস ও সামুদ্রিক ইল মাছের পটকা ও পাখনা রপ্তানি হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের তথ্যমতে, চট্টগ্রাম উপকূল থেকে সংগৃহীত লাক্কা মাছের পটকা মূলত চীন, হংকং,জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও সিঙ্গাপুরে চাহিদা থাকায় সেখানে রপ্তানি হচ্ছে। মো. বশর নামের এক মাছ ব্যবসায়ী বলেন, আমি আজ সকালে প্রায় ৬০টি বড় আকারের লাক্কা মাছ কিনেছি যেগুলোর ওজন প্রায় ৮০০ কেজি হবে। তবে এইসব আমি খুচরা বাজারে বিক্রি করবো পটকা ছাড়া ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা বা সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা কেজি। আর পটকা গুলো বিক্রি হবে মানভেদে প্রায় দুই হাজারের বেশি দামে। কারা এইসব পটকা কিনবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অনেক পটকা রপ্তানিকারক আছেন যাদের লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এইসব নিয়ে যায়। তারা শুকিয়ে এইসব পটকা আর পাখনা বাইরের দেশে রপ্তানি করে। জানা গেছে, লাক্কা মাছের পটকা শুকিয়ে 'ড্রাইড ফিশ ব্লাডার' বা 'ফিশ ম' নামে পরিচিত পণ্য তৈরি করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে চীনে ঐতিহ্যবাহী ওষুধ তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি প্রসাধনী শিল্পে কোলাজেনের উৎস হিসেবে এবং জেলাটিন হিসেবেও এর ব্যবহার রয়েছে। অনেক দেশে এটি দামি ও বিলাসবহুল খাবার হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, মাছের পাখনাও শুকিয়ে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্যুপ ও বিশেষ রান্নায় এর ব্যবহার জনপ্রিয়। এসব পণ্য সাধারণত উচ্চবিত্ত ভোক্তাদের কাছে বেশি চাহিদাসম্পন্ন। চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) মেরিন বায়োরিসোর্স সাইন্সের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান জুয়েল বলেন, সামুদ্রিক মাছ লাক্কা সহ বড় জাতের যেসব মাছ আছে সেসবের বাইরের দেশে নানা কারনে চাহিদা আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা খাতে। আগে মানুষের কোথাও কাটাছেড়া হলে সেগুলো সেলাই করতে যে সুতা ব্যবহার হতো তা কিছুদিন পর কেটে ফেলতে হয়। কিন্তু এখন লাক্কা সহ সামুদ্রিক মাছের পটকা থেকে যে সুতা তৈরি হয় তা মানুষের দেহেই মিলিয়ে যায় যার কারনে এই পটকার চাহিদা অনেক। তিনি আরও বলেন, সামুদ্রিক মাছের পটকা (air bladder) বা বায়ুথলি থেকে উচ্চমানের কোলাজেন সমৃদ্ধ জেলাটিন তৈরি করা হয়, যা খাদ্য, ওষুধ ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি মূলত মাছের প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্য থেকে তৈরি করা হয়, যা পরিবেশবান্ধব। এই জেলাটিন জেলি ডেজার্ট, আইসক্রিম এবং ক্যাপসুল তৈরিতে বহুল ব্যবহৃত। যেমন ভিটামিন এ বা ই ক্যাপসুল বা এই ধরনের মেডিসিন গুলোর খোলস তৈরি হয় শুকরের পটকা দিয়ে কিন্তু সেগুলো হারাম হওয়ায় ব্যবহার হত কম। কিন্তু মাছের পটকা থেকে যে জেলাটিন পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে এই ভিটামিনের খোলস তৈরি হয়। এছাড়াও অনেক দেশে স্বাস্থ্যগুণ সম্পন্ন স্যুপ ও খাবারের উপাদান হিসেবেও এই পটকা ও পাখনা ব্যবহার হচ্ছে। মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রন দপ্তর চট্টগ্রামের পরিদর্শক শাখাওয়াত হোসেন বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে আমাদের কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রায় ২০ মেট্রিক টন মাছের পটকা (এয়ার ব্লাডার) রপ্তানি হয়েছে। যার বাজার মূল্য ১ লক্ষ ৩১ হাজার ডলার। বিশেষ করে কোরাল লাল পোয়া, বোয়াল পাঙ্গাস ও সামুদ্রিক ইল মাছের পটকা বেশি পরিমানে রপ্তানি হয়। তবে সাগরে লাক্কা মাছ মাঝেমধ্যে পাওয়া যায় বলে এর পটকার দাম বেশি কিন্তু পাওয়া যায় কম। তবে অন্য সামুদ্রিক মাছের পটকা পাওয়া যাচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে কতজন এই পটকা ও পাখনা রপ্তানি করেন জিজ্ঞেস করলে শাখাওয়াত বলেন, চট্টগ্রাম থেকে ৪ থেকে ৫ জন ব্যবসায়ী এই ব্যবসার সাথে জড়িত। বিটি ফুডস নামের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা জানান, আগের মত অর্ডার পাওয়া যায়না এখন, বিভিন্ন দেশে অস্থিরতার কারণে গ্রাহক কমেছে। তবে চট্টগ্রাম থেকে জানুয়ারিতে ২ টন সামুদ্রিক মাছের পটকা ও পাখনা রপ্তানি করেছে তাদের প্রতিষ্ঠান। এইসব পটকা হংকং ও তাইওয়ানে রপ্তানি করেন তারা। তিনি আরও বলেন, গত বছর আমাদের প্রতিষ্ঠান এই পটকা রপ্তানি করেছিলো তবে এই অর্থ বছরে এখনও অর্ডার না আসায় সে পরিমানে পাঠানো যায়নি। আর লাক্কা মাছের পটকা বাজারে উঠার আগে চট্টগ্রামে অবস্থান করা চায়নার লোকজন সেসব সংগ্রহ করে ফেলেন যার ফলে আমরা তেমন একটা পাইনা। এই পটকা রপ্তানির সাথে জড়িত অপর এক কারখানার শ্রমিক বলেন, বিভিন্ন এলাকার বাজার থেকে মাছের কাঁচা পটকা (একটি) ২০ থেকে ১০০ কিংবা ৫০০ টাকা দরে কেনেন তারা। মাছ ও মাছের আকারভেদে শুকনা পটকা কেজি দরেও কেনেন তারা। দাম পড়ে ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা। আর শুকনো পাখনার কেজি সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা। তিনি আরও বলেন, কাঁচা পটকা এনে শুকানোর পর ফিমিউগেশন (ধোঁয়া দিয়ে শোধন) করা হয়। এরপর প্যাকেটে ভরে রপ্তানি করা হয়। লাক্কা ছাড়াও কামিলা মাছের পটকার প্রতি কেজির রপ্তানিমূল্য প্রায় ৪০০ ডলার। লাক্কার রপ্তানিমূল্য কেজি প্রতি ২০ থেকে ৫০ ডলার। চট্টগ্রামে এখন পাঁচ থেকে ছয়জন ব্যবসায়ী পটকা-পাখনা রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত। বছরে এই খাতে রপ্তানির পরিমাণ চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৫ কোটি টাকা। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা, ফিশারিঘাট এলাকার জেলেরা জানান, আগে একটি লাক্কা বা লাল কোরাল, দাতিনা কোরাল মাছ যে দামে বিক্রি করতে হতো, এখন পটকা আলাদাভাবে বিক্রি করে কয়েকগুণ বেশি আয় করা সম্ভব হচ্ছে। একেকটি মাছের পটকা কেজিতে বিক্রি করে ২০০০ থেকে ২০০০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে বলে জানান তারা। মৎস্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা ও সরাসরি রপ্তানির সুযোগ নিশ্চিত করা গেলে এই খাত থেকে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। পাশাপাশি টেকসই আহরণ নিশ্চিত করাও জরুরি, যাতে অতিরিক্ত শিকার মাছের প্রজাতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে। সব মিলিয়ে, একসময় অবহেলিত লাক্কা মাছের পটকা ও পাখনা এখন উপকূলীয় অর্থনীতিতে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। যথাযথ পরিকল্পনা ও নীতিমালার মাধ্যমে এই খাতকে আরও

বিকশিত করা গেলে দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হতে পারে নতুন এক সম্ভাবনাময় খাত। শরিফ নামের এক জেলে বলেন, 'আগে এসব অংশ ফেলে দিতাম। এখন ব্যবসায়ীরা এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এতে আমাদের আয় বেড়েছে।' তবে এই সম্ভাবনাময় খাত এখনও পুরোপুরি সংগঠিত নয়। সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক সময় পণ্যের গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া সরাসরি রপ্তানির সুযোগ সীমিত থাকায় মধ্যস্বত্বভোগীরাই বেশি লাভবান হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন জেলে ও মাছ ব্যবসায়ীরা।
(সূত্রঃ দৈনিক রুপান্তর, ১০ এপ্রিল ২০২৬)

গরুর নাড়ি-ভুঁড়ি হয়ে উঠেছে অর্থকরী

এক সময় গরু জবাইয়ের পর নাড়িভুঁড়ি ও পেনিস (পিজল) উচ্ছিষ্ট হিসেবে খাল-বিল, নদী-নালায় ফেলে দেওয়া হতো। পরিবেশ দূষণের কারণ হিসেবে বিবেচিত এসব বর্জ্য এখন দেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যে পরিণত হয়েছে। গরুর তৃতীয় পাকস্থলী বা 'ওমাসম' এবং পিজল রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ, যা বৈদেশিক মুদ্রায় আয় প্রায় ৩০০ কোটি। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে চীন, হংকং, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে নিয়মিত রপ্তানি হচ্ছে এসব পণ্য। বর্তমানে চট্টগ্রামের অন্তত ১০ জন এবং সারাদেশে প্রায় ৪০ জন ব্যবসায়ী ওমাসম ও পিজল রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। রপ্তানিকারকদের তথ্যমতে, বিশ্ববাজারে এই দুই পণ্যের সম্মিলিত বাজারমূল্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা এসব পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে পাঠানো হচ্ছে, যা দেশের অপ্রচলিত রপ্তানি খাতের অন্যতম সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, গরু জবাইয়ের পর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কসাইদের কাছ থেকে ওমাসম ও পিজল সংগ্রহ করেন। জবাইয়ের দুই ঘণ্টার মধ্যে লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয় এসব পণ্য। পরে তা আড়তদারদের কাছে বিক্রি করা হয়। আড়তদাররা পরিষ্কার, প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণের পর রপ্তানিকারকদের কাছে সরবরাহ করেন। রপ্তানিকারকরা কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করে একাধিক চালান একত্রিত করে কনটেইনারভর্তি পণ্য বিদেশে পাঠান। আড়তদাররা কাঁচা লবণযুক্ত পিজল প্রতি পিস ৮০ থেকে ১০০ টাকায় কিনে প্রক্রিয়াজাত করার পর কেজিপ্রতি ৬০০ থেকে ৮০০ টাকায় বিক্রি করেন। একইভাবে কাঁচা ওমাসম প্রতি কেজি ৫০০ থেকে ৭০০ টাকায় সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাতের পর ৮০০ থেকে হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি টন ওমাসম ৬ হাজার থেকে ৭ হাজার মার্কিন ডলার এবং পিজল ৬ হাজার ৮০০ থেকে ৭ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়। চট্টগ্রামের আতুরার ডিপোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ওমাসম ও পিজল প্রক্রিয়াজাতকরণের বড় বাজার। সংগ্রহ থেকে রপ্তানি পর্যন্ত চট্টগ্রামের প্রায় ৩০টি আড়তে এক হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করছেন। সারাদেশে এ খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার। ওমাসম রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী মোহাম্মদ আলী হোসেন জানান, গরুর ওমাসম সংগ্রহের পর প্রথমে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয়। এরপর লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। পরে আবার ধুয়ে উল্টে (ব্যাক সাইড করে) ভেতরের অংশ পরিষ্কার করা হয়। সবকিছু যাচাই-বাছাই শেষে গ্রেডিং করে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হয়। এরপর কনটেইনারে ভরে বিদেশে পাঠানো হয়। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশ থেকে মূলত চীন, হংকং ও ভিয়েতনামে ওমাসম রপ্তানি হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা সব ওমাসম চট্টগ্রামে এনে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এখান থেকেই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। মাসে গড়ে ৮ থেকে ১০টি কনটেইনার বিদেশে যায়। বিদেশে যাওয়ার পর এসব পণ্য আরও উন্নত প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন দেশের বাজারে সরবরাহ করা হয়। এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত আরেক সরবরাহকারী মোহাম্মদ ইউনুস। বেশ কয়েক বছর ধরে এই ব্যবসায় জড়িত তিনি। ওমাসম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ পণ্যে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, একসময় গরু ও মহিষ জবাইয়ের পর ওমাসম বা সাতপাল্লা কোনো মূল্যবান পণ্য হিসেবে বিবেচিত হতো না। এগুলো খাল-বিল, নালা-নর্দমায় ফেলে দেওয়া হতো। এমনকি কুকুরও অনেক সময় এসব খেত না। মোহাম্মদ ইউনুস আরও বলেন, ওমাসম সংগ্রহের পর দেশীয় লবণ ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা হয়। কোনো বিদেশি উপকরণের প্রয়োজন হয় না। পরে প্রক্রিয়াজাত করে চীনসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি কেজি ওমাসমের দাম বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী ৮০০ থেকে ৯৫০ টাকার মধ্যে ওঠানামা করে। তিনি বলেন, বর্তমানে এই খাত থেকে বছরে ৩০০ কোটিরও বেশি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। প্রতিবছর কয়েক ডজন কনটেইনার ওমাসম বিদেশে রপ্তানি হয়। সঠিকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা গেলে এই খাতের পরিধি আরও বাড়বে এবং দেশের অর্থনীতিতে আরও বড় অবদান রাখা সম্ভব হবে। রপ্তানিকারকদের তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রতিদিন জবাই হওয়া গরুর মাত্র অর্ধেকের ওমাসম ও পিজল বর্তমানে সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। কোরবানির ঈদের সময় জবাইকৃত পশুর প্রায় ৯০ শতাংশ ওমাসম ও পিজল সংগ্রহের বাইরে থেকে যায়। দেশের সব অঞ্চলে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে এ খাত থেকে প্রতিবছর হাজার কোটি টাকারও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। বিদেশে রপ্তানি হওয়া ওমাসম ও পিজল দিয়ে উন্নতমানের স্যুপ, সালাদসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য তৈরি করা হয়। বিশেষ করে চীন, হংকং, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে এসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে ইউরোপের বাজারেও

প্রবেশের পরিকল্পনা করছেন বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা। ফলে একসময়ের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট এখন দেশের অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। **(সূত্রঃ বাংলা নিউজ ২৪.কম, ৩ জুন ২০২৬)**

রাঙ্গাবালীর 'টাইগার' চিংড়িতে স্বাবলম্বী হচ্ছেন নারীরা

রাঙ্গাবালীর 'টাইগার' চিংড়িতে স্বাবলম্বী হচ্ছেন নারীরা ভোরের আলো ফোটার আগেই পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার সমুদ্র উপকূলে শুরু হয় অন্যরকম চাঞ্চল্য। গভীর সমুদ্র থেকে একে একে ফিরে আসতে থাকে ফিশিং বোট। বোটের খোলে রুপালি ঝিলিকের মাঝে দেখা মেলে বাঘের মতো ডোরাকাটা বিশাল আকৃতির সব 'টাইগার' চিংড়ির। আন্তর্জাতিক বাজারে তুমুল চাহিদা থাকা এই চিংড়িকে ঘিরেই এখন আবর্তিত হচ্ছে এই জনপদের কয়েক হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা। বিশেষ করে, উপকূলের প্রান্তিক নারীদের হাতে এই টাইগার চিংড়ি যেন হয়ে উঠেছে দারিদ্র্যতা জয়ের প্রধান হাতিয়ার। সরেজমিন দেখা যায়, বোটগুলো তীরে ভেড়ামাত্রই শুরু হয় বিশাল কর্মযজ্ঞ। ঘাট সংলগ্ন অস্থায়ী প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রগুলোতে আগে থেকেই অপেক্ষমাণ থাকেন শত শত নারী শ্রমিক। বোট থেকে নামানো তাজা চিংড়িগুলো তাদের সামনে আসতেই শুরু হয় দক্ষ হাতে বাছাই, পরিষ্কার এবং মাথা ছাড়ানোর কাজ। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তাদের হাতের ছোঁয়ায় রফতানির উপযোগী হয়ে ওঠে এই মূল্যবান মৎস্য সম্পদ। এই কর্মযজ্ঞ শুধু মাছ বাছাইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি উপকূলের নারীদের জন্য তৈরি করেছে নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা। স্থানীয় নারী শ্রমিক সাজেদা বেগম বলেন, আগে সংসারের আয়ের জন্য পুরোপুরি স্বামীর ওপর নির্ভর করতে হতো। এখন সমুদ্রের এই টাইগার চিংড়ি বাছাই করে আমি নিজেই আয় করছি। সেই টাকা দিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ দিচ্ছি, সংসারেও সচ্ছলতা এসেছে। সাজেদার মতো এমন অনেক নারী এখন আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিবারের হাল ধরেছেন। ব্যবসায়ীরা জানান, উপকূল থেকে সংগৃহীত এই চিংড়ি সরাসরি হিমাগারে পাঠিয়ে মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হয়। এরপর দেশের বিভিন্ন রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এগুলো পাড়ি জমায় ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, যা দেশের অর্থনীতিতে বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা যোগ করছে। ট্রলার মালিক কুদ্দুস হাওলাদার বলেন, জেলেরা প্রাণের ঝুকি নিয়ে সমুদ্র থেকে এই চিংড়ি আহরণ করেন। তীরে আসার পর নারীদের এই শ্রম আমাদের ব্যবসাকে সচল রাখে। তবে সরকারি সহযোগিতা ও সহজ শর্তে ঋণ পেলে আমরা আধুনিক সরঞ্জামের মাধ্যমে আহরণ আরো বাড়াতে পারতাম। অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জহিরুন্নবী বলেন, রাঙ্গাবালীর উপকূলীয় এলাকায় টাইগার চিংড়ি আহরণ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এই খাতকে আরো গতিশীল করেছে। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জেলেদের সচেতন করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আধুনিক প্রযুক্তি আর নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে উপকূলের এই 'টাইগার' চিংড়ি দেশের নীল অর্থনীতিতে (ব্লু ইকোনমি) এক নতুন বিপ্লব ঘটাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। **(সূত্র : নয়া দিগন্ত, ৩১ মে ২০২৬)**

মন্ত্রণালয়ে বর্তমান সরকারের ১০০ দিনের গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য উপাত্তের উপর সভা অনুষ্ঠিত

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে বর্তমান সরকারের ১০০ দিনের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও এর তথ্য উপাত্তের উপর সকল দপ্তর সংস্থার সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার ২০ মে ২০২৬ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো. আবুল হাছানাত হুমায়ূন কবীরের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন সিনিয়র সহকারী সচিব সৈয়দা সাদিয়া নূরীয়া। সভায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী সকল দপ্তর সংস্থা কর্তৃক ১০০ দিনের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়। সভায় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সকল দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ স্বশরীরে এবং জুম লিংকে উপস্থিত থেকে মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত সচিব হুমায়ুন কবীর বলেন, সরকারের এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে আন্তরিকতার সহিত কাজ করতে হবে। পরবর্তীতে তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। **(সূত্রঃ নিজস্ব প্রতিবেদক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর)**

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা

কাপ্তাই হ্রদে মাছের সুষ্ঠু প্রজনন, বংশবৃদ্ধি এবং অবমুক্ত করা পোনার স্বাভাবিক বিস্তার নিশ্চিত করতে সব ধরনের মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসন। সোমবার (২০ এপ্রিল) বিকেলে কাপ্তাই হ্রদ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি এবং রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফীর সভাপতিত্বে তার সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, মৎস্য আহরণ ও বাজারজাত করণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ২৪ এপ্রিল দিবাগত মধ্যরাত থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত হ্রদে সব ধরনের মৎস্য আহরণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। সভায় জানানো হয়, আগামী ২৪ এপ্রিল মধ্যরাত থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত মাছ শিকার বন্ধ হলেও ২৫ এপ্রিল বিকেল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেন (বিএফডিসি) ঘাটে আহরিত মাছ অবতরণ করা যাবে। এছাড়া আগামী ২ মে থেকে হ্রদে নতুন করে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন হ্রদে অবৈধ মাছ শিকার রোধে নৌ-পুলিশ ও বিএফডিসি'র সমন্বয়ে নিয়মিত টহল দেওয়া হবে। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে স্থাপন করা হবে অস্থায়ী চেকপোস্ট। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানও অব্যাহত থাকবে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষতিগ্রস্ত জেলে পরিবারগুলোর সহায়তায় মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির আওতায় মোট ২৬,৮৪৫টি জেলে পরিবারকে প্রতি পরিবারে ২০ কেজি হারে দুই মাসের জন্য ৪০ কেজি করে মোট ১,০৭৩.৮০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া খাদ্য সহায়তা বিতরণের বিপরীতে পরিবহন ব্যয় বাবদ প্রতি পরিবারে ৩৫০ টাকা হারে মোট ৩৭,৫৮,৩০ টাকা রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকদের নিকট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞাকালীন জেলে পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের জীবিকা সহায়তা প্রদানে সরকার কার্যকর ভূমিকা রাখছে। **(সূত্রঃ জাগো নিউজ ২৪. কম, ২১ এপ্রিল ২০২৬)**

বরিশালে বিষমুক্ত মুরগির খামার

খামারের দরজার সামনে থামতেই প্রথম নির্দেশ-'ভেতরে ঢোকার আগে হাত-পা ধুতে হবে, বদলাতে হবে জুতা।' যেন কোনো হাসপাতালের জীবাণুমুক্ত কক্ষে প্রবেশের প্রস্তুতি। নেই উৎকট গন্ধ, অথচ এটি ব্রয়লার মুরগির খামার। বরিশালের কর্ণকাঠি গ্রামের এসব খামারে মুরগি বড় হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার ছাড়াই। পরিচ্ছন্নতা আর কঠোর বায়োসিকিউরিটি মেনে গড়ে উঠছে নিরাপদ মাংস উৎপাদনের নতুন চর্চা। চরকাউয়া ইউনিয়নের কর্ণকাঠি গ্রামে ২০২৩ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ এখন বেশ আলোচিত। বরিশাল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারের কারিগরি সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিকবিহীন ব্রয়লার উৎপাদনের 'মডেল পোলট্রি ভিলেজ'। শুরুতে মাত্র ১০ জন খামারিকে নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও এখন সেই সংখ্যা বেড়েছে। আশপাশের আরও খামারিরা এই পদ্ধতিতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। প্রচলিতভাবে ব্রয়লার খামারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু কর্ণকাঠির খামারে রোগ প্রতিরোধের মূল কৌশল পরিচ্ছন্নতা, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও বায়োসিকিউরিটি। বাইরের লোকজনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত, প্রবেশের আগে হাত-পা পরিষ্কার করতে হয় এবং আলাদা জুতা ব্যবহার বাধ্যতামূলক। খামারের শেডগুলোও নিয়মিত জীবাণুমুক্ত রাখা হয়। এ উদ্যোগের আওতায় খামারিদের মুরগির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার কমানোর বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পোলট্রি পালনের জন্য নির্ধারিত ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বায়োসিকিউরিটি নির্দেশিকা অনুসরণে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে রোগের প্রকোপ কমেছে, মুরগির মৃত্যুহারও কমেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। বেড়েছে খামারিদের লাভ। আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারের জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ইব্রাহিম খলিল বলেন, পোলট্রি খাতে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ঝুঁকি। এ ঝুঁকি কমাতে কর্ণকাঠিতে মডেল পোলট্রি ভিলেজ গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে নিয়মিত তদারকিও করা হচ্ছে। কর্ণকাঠি গ্রামের তরুণ খামারি শাওন সরদারের খামারে দেখা যায়, পরিচ্ছন্ন ও খোলামেলা পরিবেশে মুরগিগুলো স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের জন্য রয়েছে শেড। তার খামারে তিনটি শেডে প্রায় তিন হাজার

ব্রয়লার মুরগি রয়েছে। সেখানে কয়েকজনের কর্মসংস্থান হয়েছে। শাওনসহ অনেক খামারির দাবি, এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত মুরগির মাংসের স্বাদ তুলনামূলক ভালো এবং চাহিদাও বাড়ছে। এখানকার অ্যান্টিবায়োটিকবিহীন মুরগি ও মাংস এখন চট্টগ্রামেও পাঠানো হচ্ছে। আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অধ্যাপক নূরুল আলম বলেন, সঠিক বায়োসিকিউরিটি, পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়াও নিরাপদ ও মানসম্মত ব্রয়লার উৎপাদন সম্ভব-কর্ণকাঠির খামারগুলো সেটিই দেখাচ্ছে। **(সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, ৪ জুন ২০২৬)**

বিলুপ্ত-বিরল মাছের অনন্য সংগ্রহশালা চাঁদপুরের ফিশ মিউজিয়াম

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মাছের বৈচিত্র্যকে জীবন্ত করে তুলেছে চাঁদপুরের ফিশ মিউজিয়াম। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই সংগ্রহশালায় রয়েছে ইলিশসহ তিন শতাধিক মাছের নমুনা। হারিয়ে যেতে বসা নানা প্রজাতির মাছ সংরক্ষণের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মৎস্যসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির কাজও করছে প্রতিষ্ঠানটি। চাঁদপুর শহরের ওয়্যারলেস এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নদী কেন্দ্রের ইলিশ ভবনের নিচতলায় গড়ে তোলা হয়েছে এই ফিশ মিউজিয়াম। দর্শনার্থীদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত না হলেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মৎস্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত এখানে এসে মাছের বিভিন্ন প্রজাতি সম্পর্কে জানছেন এবং গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ করছেন। 'বর্তমানে ফিশ মিউজিয়ামে ছোট-বড় মিলিয়ে ৩২৫টি জারে বিভিন্ন মাছ সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগই নদী ও উপকূলীয় অঞ্চলের মাছ। গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করতেই মূলত এসব নমুনা সংরক্ষণ করা হচ্ছে' সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৬২ সালে প্রথমবারের মতো এই ফিশ মিউজিয়াম স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সে সময় মৎস্য বিভাগের পরিচালক মো. ইউসুফ আলী এবং কর্মকর্তা এ কে আতাউর রহমান দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও জলাশয় থেকে নানা প্রজাতির মাছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে সেই সংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ফিশ মিউজিয়ামে রূপ নেয়। স্থানীয়রা জানায়, এই ফিশ মিউজিয়াম শুধু একটি সংগ্রহশালা নয়, বরং দেশের নদী ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ইলিশের শহর চাঁদপুরে গড়ে ওঠা এই অনন্য মিউজিয়াম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের ইতিহাস ও বৈচিত্র্য তুলে ধরছে নীরবে। দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষিত এ সংগ্রহশালাকে আধুনিক রূপ দিতে ২০২৩ সালে নতুন করে মিউজিয়ামটির সংস্কার ও আধুনিকায়নের কাজ করা হয়। বর্তমানে এখানে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে ৩২৫টি বড় ও ছোট জার। প্রতিটি জারে কেমিক্যালের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা গবেষণার প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন নদী, মোহনা ও সমুদ্র উপকূল থেকে মাছ সংগ্রহ করেন। গবেষণা কার্যক্রম শেষ হলে গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল প্রজাতির মাছগুলো সংরক্ষণ করা হয় এই মিউজিয়ামে। ফলে এটি এখন শুধু একটি প্রদর্শনী কেন্দ্র নয়, বরং মৎস্য গবেষণা ও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। '১৯৬২ সালে প্রথমবারের মতো এই ফিশ মিউজিয়াম স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সে সময় মৎস্য বিভাগের পরিচালক মো. ইউসুফ আলী এবং কর্মকর্তা এ কে আতাউর রহমান দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও জলাশয় থেকে নানা প্রজাতির মাছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু করেন' মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মাছগুলোর মধ্যে রয়েছে বিলুপ্তপ্রায় মহাশোল, বিরল প্রজাতির জইয়া মাছ, রানি মাছ, চিতল, গারুয়া, তারা বাইম, মধু পাবদাসহ অসংখ্য দেশীয় প্রজাতির মাছ। এছাড়া সমুদ্রের হাঙর মাছ, ঝিনুক, বামশ মাছ, ইলিশ এবং বিভিন্ন মাছের ডিমও সংরক্ষণ করা হয়েছে বিশেষ পদ্ধতিতে। চাঁদপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মিজানুর রহমান বলেন, দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্যেতা টিকিয়ে রাখতে হলে নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের দূষণ রোধে সবাইকে সচেতন ও সোচ্চার হতে হবে। নদী বাঁচলে দেশীয় মাছও বাঁচবে। কিন্তু নদী দূষিত হতে থাকলে একসময় এসব মাছ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, নদীর তীরে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানা, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এবং পৌরসভার বর্জ্য অবশ্যই পরিশোধনের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে, যাতে নদীর পানি দূষিত না হয়। একসময় যেসব দেশীয় মাছ সহজেই পাওয়া যেত, এখন সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই আর দেখা যায় না। কিছু প্রজাতি শুধু জাদুঘরে সংরক্ষিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। 'দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে যারা ফিশারিজ বিষয়ে পড়াশোনা করছেন, তারা নিয়মিত এখানে আসেন। বাস্তবে মাছের বিভিন্ন প্রজাতি দেখে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু জানতে পারছেন এবং গবেষণার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন' মিজানুর রহমান আরও বলেন, এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাস্তবে নয়, শুধু জাদুঘরেই এসব মাছ দেখতে পাবে। আমরা তা চাই না। আমরা চাই সচেতনতার মাধ্যমে দেশীয় মাছসহ সব প্রজাতি সংরক্ষণ ও টিকিয়ে রাখতে, যাতে মানুষ বাস্তবেই এসব জীববৈচিত্র্যেতা দেখতে পারে। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. তায়েফা আহমেদ জাগো নিউজকে জানান, বর্তমানে ফিশ মিউজিয়ামে ছোট-বড় মিলিয়ে ৩২৫টি জারে বিভিন্ন মাছ সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগই নদী ও উপকূলীয় অঞ্চলের মাছ। গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করতেই মূলত এসব নমুনা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে যারা ফিশারিজ বিষয়ে

পড়াশোনা করছেন, তারা নিয়মিত এখানে আসেন। বাস্তবে মাছের বিভিন্ন প্রজাতি দেখে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু জানতে পারছেন এবং গবেষণার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন।মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জানান, আপাতত সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য মিউজিয়ামটি উন্মুক্ত করার কোনো পরিকল্পনা নেই। কারণ এটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জনবল। বর্তমানে জনবল সংকট থাকায় সীমিত পরিসরে এটি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তবে গবেষণার কাজে কর্মকর্তারা যখন নতুন বা বিরল কোনো মাছ সংগ্রহ করেন, তখন সেগুলোও এই মিউজিয়ামে যুক্ত করা হয়। **(সূত্রঃ জাগো নিউজ, ১৮ মে ২০২৬)**

খামারের নিরাপত্তায় মোবাইল নিয়ন্ত্রিত স্বল্প ব্যয়ের ডিভাইস

দেশের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খামারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দূর থেকে নজরদারি, কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করার সুবিধা নিয়ে তৈরি হয়েছে 'সাউ স্মার্ট সিকিউরিটি ডিভাইস'। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদের ফিশিং অ্যান্ড পোস্ট-হারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মাসুদ রানা ডিভাইসটি উ দ্ভাবন করেছেন। সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে 'শেকৃবি ইনোভেশন ল্যাব'। ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), সৌরশক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সমন্বয়ে তৈরি এ ডিভাইসটি প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় স্বল্প ব্যয়ে বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে জানান মো. মাসুদ রানা। সম্প্রতি তিনি এ ডিভাইসটি সম্পর্কে সংবাদকর্মীদের অবহিত করেছেন। Communications Media Studies অফ 'সাউ স্মার্ট সিকিউরিটি ডিভাইস'-এ রয়েছে স্মার্ট মনিটরিং সিস্টেম ও আইওটি-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। খামারির অনুপস্থিতিতেও ২৪ ঘণ্টা খামারের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ, নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম। এ ছাড়া এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এতে থাকা ৩৬০ ডিগ্রি ঘূর্ণনক্ষম ক্যামেরাটি প্রতি ৩০ মিনিট পরপর ভিডিও ধারণ করে খামার মালিকের মোবাইলে পাঠায়। ফলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে পর্যবেক্ষণ ও ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এতে বিল্ট-ইন মাইক্রোফোন, স্পিকার এবং ওয়াকিটকি-সদৃশ দ্বিমুখী যোগাযোগব্যবস্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে খামার মালিক দূরে থেকেও কর্মচারীদের সরাসরি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারবেন। ডিভাইসটিতে মিনি রাউটার বা সিমভিত্তিক ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা থাকায় এটি সবসময় অনলাইন থাকে। ডিভাইসটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক এর উন্নত এআই-ভিত্তিক নিরাপত্তাব্যবস্থা। খামারের অনুমোদিত ব্যক্তিদের ছবি এতে আগে থেকেই সংরক্ষণ করা যায়। উদ্ভাবক মো. মাসুদ রানা বলেন, ডিভাইসটির নির্মাণ ব্যয় প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন হলে এটির ব্যয় আরও কমে আসবে। **(লেখকঃ মো. এমদাদুল হক, ১৪ জুন ২০২৬)**

কক্সবাজারে যে উপায়ে হচ্ছে বিষমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর শুঁটকির উৎপাদন

বাজারে পাওয়া যাওয়া অধিকাংশ শুঁটকিতে রয়েছে কীটনাশকসহ নানা ধরনের রাসায়নিক। এ কারণে নিরাপদ শুঁটকি খুঁজতে অনেককেই গলদঘর্ম হতে হয়। কক্সবাজার উপকূলে প্রতিবছর প্রায় ৬০০ কোটি টাকার শুঁটকি উৎপাদিত হলেও গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। এ ছাড়া অনেক শুঁটকিতে রাসায়নিকের অস্তিত্বও পাওয়া যায়। তবে কক্সবাজার সৈকত খনিজ বালি আহরণ কেন্দ্রের পরমাণু গবেষকেরা নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। সোনাদিয়া দ্বীপে বাণিজ্যিকভাবে এমন শুঁটকি উৎপাদনে সাফল্যও এসেছে। শুঁটকির মূল শত্রু হিসেবে 'ব্লোফাই'(নীলচে সবুজ মাছি) নামের একধরনের মাছিকে চিহ্নিত করেছেন পরমাণু গবেষকেরা। মাছ শুকানোর সময় এই মাছি মাছের গায়ে ডিম পাড়ে। এর লার্ভা মাছের ভেতরের অংশ খেয়ে বড় হয়; আর লার্ভার কবল থেকে শুঁটকি বাঁচাতে তাতে দেওয়া হয় কীটনাশক। কক্সবাজারের গবেষকেরা একটি বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পুরুষ মাছিকে বন্ধ্যা করেছেন। এসব বন্ধ্যা মাছি স্ত্রী মাছির সঙ্গে মিলিত হলেও কোনো ডিম হয় না। ফলে মাছি আর ডিম পাড়তে পারে না। এতে মাছির বংশও যেমন কমে যায়, তেমনি শুঁটকিতে ডিম পাড়ার ভয়ও থাকে না। শুঁটকি হয় সম্পূর্ণ নিরাপদ। মাছি বন্ধ্যা করতে ১০ কোটি টাকার যন্ত্র কক্সবাজার শহরের একটি সুরক্ষিত ভবনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে স্থাপন করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অত্যাধুনিক এক যন্ত্র। নাম 'গামা সোর্স বা কোবাল্ট-৬০'। পরমাণু প্রযুক্তির এই মূল্যবান যন্ত্রের দাম প্রায় ১০ কোটি টাকা। সারা দেশে এমন যন্ত্র আছে মাত্র দুটি। পরমাণু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই যন্ত্রের প্রধান কাজ হলো ল্যাবরেটরিতে

উৎপাদিত ক্ষতিকর 'ব্লোফ্লাই' (নীল মাছি) পুরুষ মাছিকে গামা রশ্মির সংস্পর্শে এনে প্রজননক্ষমতা নষ্ট বা বন্ধ্যা করা। এই বন্ধ্যা মাছির মাধ্যমে বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদন সম্ভব। পরমাণু বিজ্ঞানীদের মতে, উচ্চপ্রযুক্তির পরিবেশবান্ধব এই কোবাল্ট-৬০ মেশিনটি সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে প্রতিবছর শতকোটি টাকার খাদ্যশস্য অপচয় রোধ এবং মানসম্মত শুঁটকি রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। যেভাবে চলে মাছি বন্ধ্যাকরণের প্রক্রিয়া 'ব্লোফ্লাই' বা নীল-সবুজ রঙের মাছিগুলো সাধারণ ঘরের মাছির চেয়ে আকারে বড় ও চকচকে হয়। এরা প্রধানত পঁচা মাছ-মাংস বা আবর্জনায় ডিম পাড়ে। কক্সবাজার সৈকতের খনিজ বালু আহরণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ল্যাবরেটরিতে এই মেশিনের মাধ্যমে মাছি বন্ধ্যাকরণের কাজ চলছে। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মোশাররফ হোসেন জানান, ১০ কোটি টাকার এই মেশিন ল্যাবে স্থাপন করা হয় ২০১৮ সালে। ২০০১ সাল থেকে

সোনাদিয়া দ্বীপে বন্ধ্যা মাছি ছেড়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল। ২০২১ সালে ৫ লাখ বন্ধ্যা মাছি ছেড়ে সেখানে বাণিজ্যিকভাবে বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এরপর তিন বছরে সোনাদিয়ায় অন্তত ৯০ লাখ বন্ধ্যা মাছি ছাড়া হয়েছে এবং বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদনে অভূতপূর্ব সফলতা এসেছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের বিকিরণ কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ড. এ টি এম ফয়েজুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী এই প্রকল্প নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি বলেন, মাঠের মাছি গবেষণাগারে এনে কৃত্রিম উপায়ে লাখ লাখ মাছি উৎপাদন করা হয়। মাছির মূককীট (পিউপা) দশায় নির্দিষ্ট মাত্রায় গামা রশ্মি বা রেডিয়েশন দিলে তাদের প্রজনন অঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং তারা বন্ধ্যা হয়ে যায়। এই বন্ধ্যা পুরুষ মাছিগুলো শুঁটকি পল্লিতে ছেড়ে দিলে তারা মাঠের স্বাভাবিক স্ত্রী মাছির সঙ্গে প্রজনন করে; কিন্তু বন্ধ্যা হওয়ার কারণে স্ত্রী মাছির ডিমগুলো নিষিক্ত হয় না। ফলে নতুন করে আর লার্ভা জন্মায় না এবং প্রাকৃতিকভাবেই মাছির সংখ্যা কমে যায়। শুঁটকিতে বিষ ছড়ানোর নেপথ্যে সাধারণত কাঁচা মাছ রোদে শুকানোর সময় মাছি মাছের ফুলকা ও ভেজা অংশে ডিম পাড়ে। ১০-১২ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়ে মাছ খাওয়া শুরু করে। ৩-৪ দিন পর এগুলো মূককীটে রূপান্তরিত হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মাছি হয়ে আবার প্রজনন ঘটায়। এই লার্ভার আক্রমণ থেকে শুঁটকি বাঁচাতে উৎপাদনকারীরা কাঁচা মাছে ক্ষতিকর ও বিষাক্ত কীটনাশক প্রয়োগ করেন। এই বিষাক্ত শুঁটকি খাওয়ার ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায় এবং ক্যানসার, লিভার, কিডনি ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। এমনকি গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত বা বিকলাঙ্গ শিশু জন্মের আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়া শুঁটকি মহালের শ্রমিকেরা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই বিষাক্ত কীটনাশক শরীরে গ্রহণ করায় দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েন। পরমাণু বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বলা হয়, দেশে উৎপাদিত মাছের ১৫ শতাংশ শুকিয়ে শুঁটকি করা হয়। কিন্তু মাছির আক্রমণে প্রায় ৬০ শতাংশ শুঁটকি খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে, যার আর্থিক ক্ষতি বছরে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। খাদ্যশস্যের সুরক্ষা ও জীবাণুমুক্তকরণ গামা সোর্স মেশিনের রেডিয়েশন প্রযুক্তির ব্যবহার শুধু শুঁটকি উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি খাদ্য সুরক্ষায় এক বৈপ্লবিক সমাধান। পরমাণু বিজ্ঞানী মো. মোশাররফ হোসেন বলেন, গুদামজাত ধান, চাল বা ডালে 'উইভিল' বা ঘুণপোকা আক্রমণ করলে অল্প মাত্রার রেডিয়েশন দিয়ে পোকা ও তাদের ডিম সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যায়। এতে কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক (যেমন; ফসফিন ট্যাবলেট) ব্যবহার করতে হয় না। তা ছাড়া আটা-ময়দা বা গুঁড়া মসলায় (মরিচ, হলুদ, ধনে) আর্দ্রতার কারণে দ্রুত ব্যাকটেরিয়া বা সালমোনেলা জন্মাতে পারে। গামা রশ্মি এগুলোকে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করে দীর্ঘকাল সতেজ রাখে। একইভাবে আলু বা পেঁয়াজে নির্দিষ্ট মাত্রায় রেডিয়েশন দিলে তা থেকে আর নতুন কুঁড়ি বা গাছ বের হয় না, ফলে এগুলো দীর্ঘদিন ভালো থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যসামগ্রী ও শুঁটকি রপ্তানি করতে হলে এই মেশিনের মাধ্যমে মান যাচাই বাধ্যতামূলক। প্রকল্পের পরিচালক ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মোশাররফ হোসেন জানান, ১০ কোটি টাকার এই মেশিন ল্যাবে স্থাপন করা হয় ২০১৮ সালে। ২০০১ সাল থেকে সোনাদিয়া দ্বীপে বন্ধ্যা মাছি ছেড়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল। ২০২১ সালে ৫ লাখ বন্ধ্যা মাছি ছেড়ে সেখানে বাণিজ্যিকভাবে বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এরপর তিন বছরে সোনাদিয়ায় অন্তত ৯০ লাখ বন্ধ্যা মাছি ছাড়া হয়েছে এবং বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদনে অভূতপূর্ব সফলতা এসেছে। ১০ কোটি টাকার যন্ত্রটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তেজস্ক্রিয়তা রোধে এটিকে কয়েক ফুট পুরু কংক্রিট ও সিসার তৈরি বিশেষ কক্ষে রাখা হয়েছে এবং পরমাণু শক্তি কমিশনের দক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের মাধ্যমে এর সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবদুল শুক্কুর বলেন, এই প্রযুক্তির বাণিজ্যিক প্রসার ঘটানো গেলে দেশের অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্য–উভয় ক্ষেত্রেই এক বিশাল পরিবর্তন আসবে। **(সূত্র: প্রথম আলো, ১০ জুন ২০২৬)**

"নিরাপদ শুঁটকির উৎপাদন করি অর্থনীতির সমৃদ্ধি গড়ি"

সরকারি অনুদানের ছাগল পালন করে ঘুরছে গৃহবধূর ভাগ্যের চাকা

গ্রামের অতি সাধারণ গৃহবধূ রিংকু বৈদ্য (৩২)। স্বামী অমল বৈদ্য, ছেলে রাজ বৈদ্য ও শ্বাশুড়ি করুণা বৈদ্যকে নিয়ে তার সংসার। স্বামী জলাশয়ে মাছ ধরে সংসার চালান। ছেলে ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। সামান্য আয় দিয়ে স্বামী ৪ জনের সংসারে চালাতে পারেন না। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। জরাজীর্ণ বসতঘর বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। পরিবারটিতে রিদ্রতা চরম আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সরকারিভাবে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পরিবারটিকে বিনামূল্যে ২টি ছাগল দেয়া হয়। এ ছাগল ১১টি বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। গত কোরবানীর ঈদে ৮টি ছাগল ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। এ টাকা দিয়ে রিংকু নতুন ঘর করছেন। ছাগল পালন করে ওই গৃহবধূ একটু একটু করে সংসার থেকে অভাব অনটন দূর করছেন। ছেলে স্কুলে যাচ্ছে। পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরতে শুরু করেছে। রিংকু বৈদ্য গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার অমল বৈদ্যর স্ত্রী। শুধু রিংকু বৈদ্য নয়, জেলার আরো ৮শ' দরিদ্র জেলে পরিবারও এভাবে সরকারি অনুদানের ছাগল পালন করে সংসারে বাড়তি রোজগারের সুযোগ পেয়েছে। ওই পরিবারগুলোতেও এসেছে স্বচ্ছলতা। দেশীয় প্রজাতির মাছ ও শামুক সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মোহাম্ম মনিরুল ইসলাম বলেন, 'দেশীয় মাছের প্রজনন মৌসুমে জেলেদের মাছ ধরা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এ জন্য তাদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে গোপালগঞ্জ জেলার ৮শ' পরিবারে ছাগল বিতরণ করা হয়। ছাগল পালন করে পরিবারগুলোতে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। তাই তারা মাছ ধরা বন্ধ রেখেছে। এতে খাল, বিল ও জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।' ওই কর্মকর্তা আরো বলেন, 'গোপালগঞ্জসহ ১০ জেলায় আমাদের এ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এক জরিপে দেখা গেছে, ২০২১ সালে প্রকল্পের শুরুতে ১০ জেলায় দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন ছিল ৪ লাখ টন। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত এসব জেলায় দেশীয় মাছের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ হাজার টন । চলতি জুনে ১০ জেলায় মাছের উৎপাদন আরো ১৪ হাজার টন বৃদ্ধি পাবে। মাছের উৎপাদন ১৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৪ লাখ ৬৪ টনে উন্নিত হবে বলে আমরা আশা করছি।' নারকেলবাড়ি গ্রামের গৃহবধূ রিংকু বৈদ্য বলেন, মৎস্য অফিস থেকে ২টি ভালো জাতের ছাগল পাই। পরম যত্নে লালন পালন করি। ২২ মাসে ২টি থেকে ১৩টি ছাগল হয়। কোরবানীর সময় ৮টি ছাগল ৫০ হাজারে বিক্রি করেছি। এ টাকা দিয়ে বসতঘর করছি। স্বামী ও আমি সুযোগ পেলেই মাঠে দিন মজুরি করছি। ছেলে লেখাপড়া করছে। এখন আগের তুলনায় বেশ ভালো আছি। এখন পালে ৫টি ছাগল আছে। এ ছাগল ৩ বছর লালন পালন করলে পালে কমপক্ষে ৪০টি ছাগল হবে। ছাগল পালন করে আমি অভাব দূর করতে পারব।' রিংকুর স্বামী অমল বৈদ্য বলেন, 'ছাগলের জাত খুব ভালো। ৫/৬ মাসের মধ্যে একটি ছাগল ৬ থেকে ৮ কেজি ওজন হয়ে যায়। ছাগল বিক্রির উপযোগী হয়ে পড়ে। ছাগল পালন লাভজনক। ছাগল পেয়ে আমি প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা বন্ধ রেখেছি। এ সময় ছাগলের ঘাস কাটি, আর বাজার ও মাঠে দিন মজুরের কাজ করি। এখন সংসার ভালো চলছে। প্রজনন মৌসুমে আমার মতো এলাকার অনেকে মাছ ধরা বন্ধ রেখেছে। এতে খাল-বিলে দেশী প্রজাতির মাছ বেড়েছে। মাছ আহরণ মৌসুমে খাল বিলে বেশি মাছ পাচ্ছি। ফলে দিন দিন আমাদের স্বচ্ছলতা বাড়ছে।' দেশীয় প্রজাতির মাছ ও শামুক সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের পিডি মো. খালিদুজ্জামান বলেন, 'দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে প্রকল্প থেকে গোপালগঞ্জসহ ১০ জেলার ৮ হাজার ৪০৫ পরিবারে দুটি করে ছাগল দেয়া হয়েছে। প্রজনন মৌসুমে মাছধরা বন্ধ রেখে ছাগল পালন করে তারা বিকল্প আয়ের সুযোগ পেয়েছে। এরমধ্যে কোটালীপাড়ার গৃহবধূ রিংকু অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তার মতো ১০ জেলার ৮ হাজারেরও পরিবার ছাগল পালন করে পরিবারে বাড়তি আয় করছে। এটিই হল এ প্রকল্পের অন্যতম সাফল্য।' **(সূত্রঃ দৈনিক বণিক বার্তা, ১৪ জুন ২০২৬)**

সম্মানিত লেখকদের প্রতি আহবান :

প্রিয় সুহৃদ,

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর হতে "আমিষ বার্তা "নামে একটি ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের সৃজনশীল এই যাত্রায় আপনাকে স্বাগত। আমাদের ম্যাগাজিনের আসন্ন ২য় বর্ষের চতুর্থ (৪র্থ) সংখ্যার জন্য লেখা আহবান করা হচ্ছে। আপনি যদি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উদ্ভাবন, সফলতার গল্প ও প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে লিখতে চান, তাহলে আমাদের সঙ্গে লেখা পাঠিয়ে যুক্ত হন।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ১৫ ই সেপ্টেম্বর ২০২৬

লেখার পরিমাণ: সর্বোচ্চ ১২০০ ওয়ার্ড (অবশ্যই সুতনী এম জে ফন্ট ব্যবহার করতে হবে)

লেখার সঙ্গে লেখকের পূর্ণ পরিচয় ও পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সফট কপি)

ইমেইল /যোগাযোগ: headquarter@flid.gov.bd

০১৭১৭৬০৮৬২২ **(Whats app)**

আপনার লেখাই হতে পারে আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

গবাদিপশু নাইট্রেট বিষক্রিয়া প্রতিরোধে করণীয়

নাইট্রেট বিষক্রিয়া কী?

- নাইট্রেট গবাদিপশুর জন্য ক্ষতিকর নয়, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করলে গবাদিপশুর দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।
- দীর্ঘদিন খরার পর হঠাৎ করে বৃষ্টি হলে সদ্য গজানো কচি ঘাসে
- নাইট্রেট ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; যা গবাদিপশুর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- বৃষ্টির পানিতে মিশ্রিত এসিডের সাথে কচি ঘাসের নাইট্রোজেন
- রাসায়নিক ভাবে নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষক্রিয়া উৎপাদন করে।
- গরু দ্রুত বর্ধনশীল সবুজ কচি ঘাসের সাথে এ বিষ গ্রহণ করে।
- ফলে রক্তে অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে গবাদিপশু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এবং মৃত্যু হতে পারে।

কখন এই রোগ বেশি হয়?

- সাধারণত বছরের নির্দিষ্ট সময়ে-মে থেকে জুলাইয়ের মধ্যে গরমের পর যখন বৃষ্টি হয়;
- খালি পেটে গরুকে মাটে চরানোর জন্য পাঠালে;
- অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার করা জমির ঘাস খেলে;
- হঠাৎ বেশি পরিমাণে মাঠ হতে সংগ্রহ করা কচি ঘাস খাওয়ালে;
- দুর্বল, রোগাক্রান্ত বা অনাহারে থাকা পশুদের ক্ষেত্রে হতে পারে।

লক্ষণগুলো কী কী?

- খুব দ্রুত, জোরে জোরে শ্বাস নিবে;
- গা কাঁপতে থাকে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না;
- পাতলা পায়খানা;
- নাক-মুখ থেকে লালা ঝরে;
- জিহ্বা, চোখ ও নাকের চারপাশে নীলচে রঙ ধারণ করবে;
- খাওয়া বন্ধ করে দিবে;
- দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিবে;
- বেশি মাত্রায় হলে ২ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটতে পারে;
- মৃত পশুর শরীরে চকলেট রঙের রক্ত (অক্সিজেনবিহীন রক্ত) পাওয়া যাবে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয়

- বৃষ্টির পরপরই মাঠ থেকে কেটে আনা ঘাস গবাদিপশুকে খাওয়াবেন না;
- ঘাস ২-৩ ঘন্টা শুকিয়ে গবাদিপশুকে সরবরাহ করুন;
- খালি পেটে কচি ঘাস খাওয়াবেন না। আগে কিছু শুকনা খাবার দিন;
- ঘাস উৎপাদনে ইউরিয়া সারের পরিমাণ কমান;
- জৈব সার ব্যবহার করে ঘাস উৎপাদন করুন। জমি থেকে গজানো ঘাসে
- কতটুকু নাইট্রেট আছে সুযোগ থাকলে অবশ্যই তা পরীক্ষা করুন।

যে কোনো পরামর্শের জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করুন

জনসচেতনতায়: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪৩৩
এপ্রিল-জুন ২০২৬

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা